ছিলেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে একটি দরিদ্র সম্ভ্রান্ত বংশে জিজিভাই জন্ম গ্রহণ করেন; এবং বাল্যকালেই পিতৃ মাতৃহীন হওয়ায় অভাবের কষাঘাত জনিত কষ্ট বেশ ভালরূপ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যালয়ে যৎসামান্যই শিক্ষা পাইয়াছিলেন; এবং যখন অতিমাত্র বালক, তখনই তাঁহাকে উদরান্নের জন্য কোন ব্যবসায়ীর অফিসে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। চিঠি নকল করিয়া বা ইনভয়েস লিখিয়াই জীবন কাটাইবার জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই। বালক তাঁহার ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিতে না করিতেই স্বাধীন ব্যবসায়ী হইতে কৃত-প্রতিজ্ঞ হন। অতঃপর তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া ব্যবসায় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাহার যৎসামান্য মূলধন লইয়া ও বন্ধুগণ হইতে কিছু সাহায্য পাইয়া উন্নতির মুখ দেখিবার আশায় সেই অল্প বয়সে তিনি তাঁহার মাতৃভূমি ত্যাগ করিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে কলিকাতায় আসিয়া অসম সাহসী বালক অল্প কমিশন লইয়াই চীন দেশে চলিয়া গেলেন। সে সময় চীনের ব্যাপার জগতের নিকট একরূপ অজ্ঞাত ছিল সুতরাং সমস্ত বিপদ উপেক্ষা করিয়া বালক চীনে উপনীত হইলেন। কি বিষম অথচ অনুকরণীয় সাহস। সুখের বিষয় তিনি তাঁহার এ সাহসের যথার্থ পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তাহার ব্যবসায় বেশ পরিচালিত হওয়ায় সর্ব্বদাই তাঁহাকে যাতায়াত করিতে হইত।

১৮০৪ সালে জিজিভাই যে জাহাজারোহণে যাইতেছিলেন সেই জাহাজ ফরাসীগণ কর্ত্তৃক ধৃত হয় ও তাঁহার দ্রব্যাদি সমস্তই হৃত হয়। তিনি নিঃসম্বল অবস্থায় উত্তমাশা অন্তরীপে পরিত্যক্ত হন। এই সময় এই অন্তরীপ ডাচদিগের অধীনে ছিল। কয়েকজন ডাচরমণী তাঁহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন। ভারতবর্ষে আসিয়া জিজিভাই একবিংশ বয়ঃক্রমকালে আবার নূতন করিয়া কার্য্যারম্ভ করেন। এত দুঃখ কষ্টেও দমিত না হইয়া যুবক আবার চীন যাত্রা করিলেন। বয়সের সঙ্গে এবার তাঁহার জ্ঞানও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ক্রমে তিনি বোম্বায়ের সর্ব্বাপেক্ষা ধনী পার্শীদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার সৌভাগ্যের কালেও তিনি তাহার দারিদ্র্যাবস্থার কথা ভুলিতে পারেন নাই। তিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য বহু দান ধ্যানে দেশের যথেষ্ট মঙ্গল করিয়া গিয়াছেন! তিনি জনসাধারণের নেতৃত্ব পাইয়া ছিলেন। জনসাধারণের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ থাকায় তিনি ১৮৪২ সালে "নাইট" উপাধি ও ১৮৫৮ সালে ব্যারেণস্ব Baron-t) প্রাপ্ত হন। জিজিভাই ৯৪ বর্ষ বয়সে ১৮৭৭ সালে মবধাম ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি ভারতের জন্য একজন স্বনাম-ধন্য মহাপুরুসের চরিত্র রাখিয়া যান।

আমাদের শেষোক্ত সম-শিক্ষনীয় উপাখ্যানটি পরলোকগত পরম উদ্যমী সার জিজ ম্যানোকজি পেতিত সম্বন্ধে প্রযুয্য হইতে পারে এই পেতিত পরিবারের প্রতিষ্ঠাত্রী

গত শতাব্দীর প্রথম ভাগের একজন পার্শী ব্যবসায়ী। পেতিত—এই নামের উদ্ভব সম্বন্ধে বেশ একটি সুন্দর গল্প আছে।

এক শতাব্দী পূর্ব্বে ফরাসীরা ভারতবর্ষের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। এখন আর তাহাদের সেরূপ ভাব দেখা যায় না। সে সময় তাহাদের অনেকেই ফরাসী বীর ডুপ্লের আমলের লোক ছিল! তাহারা ডুপ্লের সেই মহা গৌরবের দিন ও ১৭৪৬ সালের মান্দ্রাজ অবরোধ তখনও ভুলিতে পারে নাই। তখনও হৈদার আলী ও দেশীয় অন্যান্য রাজন্য বৃন্দের অধীনে তাহারা যুদ্ধ সংক্রান্ত কার্য্যে লিপ্ত ছিল। ১৮১০ সালে ইংরাজেরা ফরাসীগণের নিকট হইতে বুর্ব্বণ ও মুরিসাস অধিকার করে। এই দ্বিপদ্বয় হস্তে থাকায় ফরাসীরা পূর্ব্বে প্রাচ্যদেশে ইংরাজের ক্ষমতা প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, এবং অর্দ্ধ শতব্দী যাবৎ ভারতীয়বাণিজ্য তাহাদের কৃপাধীন হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮১৩ সালে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি হইতে ভারতীয় বাণিজ্যের একচেটিয়াত্ব অপহৃত হইল তখন বোম্বাই ফরাসী জাহাজের কাপ্তেন ও ফরাসী ব্যবসায়ী পূর্ণ ছিল।

একজন পার্শী ব্যবসায়ী এই ফরাসী দিগের সহিত ব্যবসায়ে বিশেষ ধনশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ম্যানোকৃজি দুসরবাঞ্জি কাবাসজি বমোনজি। এত বড় নাম উচ্চারণ করিবার ধৈর্য্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে বড় কাহারও দেখা যায় না। নামের দীর্ঘত্বের তুলনায় তিনি অতি খর্ব্ব ব্যক্তি ছিলেন। ফরাসীরা তাঁহার সেই আকার লক্ষ করিয়া তাঁহাকে 'লে পেতি' অর্থাৎ 'খর্ব্ব ব্যক্তি' এই নাম দেন। পার্শীরা নব প্রাপ্ত নামটি আপনার করিয়া লইতে বড়ই মজবুত। আজি কালিকার মিঃ রিপোর্টার', 'মিঃ বটল্‌ওয়ালা', 'মিঃ বাইটার', --এগুলি ইংরাজদের কেবলমাত্র অনুকরণ। ইংরাজদের ন্যায় এগুলি পার্শীদের কোন পূর্ব্ব পুরুষের পেশার নাম। আমদের ঐ পার্শী ব্যবসায়ী এইরূপে তাঁহার 'পেতি' নামটি আপনার করিয়া লইয়া ছিলেন। উক্ত কথার ইংরাজি উচ্চারণ 'পেতিত'। আজ এই 'পেতিত' নামে তাঁহার বংশাবলী পরিচয় দান করে। এই পেতির পুত্রই আমাদের আদর্শ পুরুষ।

দিন্স ম্যানোকৃজি পেতিত ১৮২৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও পিতার ন্যায় ব্যবসায়ী ছিলেন। দিন্স যেমন কার্য্যক্ষম ব্যক্তি ছিলেন, সেইরূপ 'দাও' বুঝিয়া কার্য্য করিতে জানিতেন। ১৮৬১ সালে আমেরিকার অন্তর্বিপ্লব ঘটে। তাহাতে তুলার যথেষ্ট ক্ষতি হয়, ও কয়েক বৎসর ধরিয়া ল্যাঙ্কেসায়ারের কাপড়ের বাজার একেবারে মাটি হয়। এই সময় দিন্স ভারতীয় বাণিজ্যের সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া কাপড়ের কল স্থাপনের জন্য বোম্বায়ে সেই বৎসর খানিকটা জায়গা সংগ্রহ করেন; এবং পর বৎসরই সর্ব্বপ্রথম কল বসাইয়া 'ম্যানোকৃজি পেতিত কোম্পানি' নামে কারবার আরম্ভ করিয়া দেন। প্রথমে এ ব্যবসায় আদৌ উৎসাহোদ্দীপক হয় নাই। বোম্বায়ে কাপড় তৈয়ারী করা না হয় সহজ হইতে পারে, কিন্তু

সেগুলি খুচরা কিম্বা নিলামে বিক্রয়ের হাত হইতে বাঁচাইয়া বাজারে ক্রেতা সংগ্রহ করা বড়ই শক্ত কথা। কিন্তু দিন্সের অদম্য উৎসাহে ও কার্য্য কুশলতায় তাঁহার কারবার ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল। এবং ১৮৮১ সালে তিনি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এঞ্জিন বসাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন; এবং ম্যানোক্‌জি পেভিত ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোম্পানি একটী ধনী ও ক্ষমতাশালী কারবারী হইয়া উঠিল।

আমাদের এই উদ্যমী ভদ্রলোকটী কেবল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। সমস্ত জীবন আত্ম-সম্মানে কাটাইয়া বৃদ্ধ বয়সে সাধারণের সম্মান আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। ১৮৮৭ সালে ৬৪ বৎসর বয়সে তিনি বোম্বায়ের সেরিফ হন ও নাইট উপাধি প্রাপ্ত হন। পর বৎসর বড়লাটের কৌন্সিলে সভ্যপদ প্রাপ্ত হন। ১৮৯০ সালে ৬৭ বৎসর বয়সে তিনি 'ব্যারোনেট' হন। এই বৎসর তাহার স্ত্রী সকরবাই স্বর্গারোহন করেন। হেরল্ডস্ আফিস হইতে তিান একটি বর্ম্ম উপহার পাইয়াছিলেন।

'পেতি" শব্দের ফরাসী অর্থ "খর্ব্ব" এবং ল্যাটিন অর্থ 'অন্বেষণকারী'। একটী ল্যাটিন কথা তাঁহার বংশের একটী মন্ত্র (Family Motto) তাহা এই—( Consequitur quod cunque petit ) অর্থাৎ 'সে যাহা চায়, তাহাই পায়"। কিন্তু পেভিত বংশ এই "চাওয়া" অর্থে ভিক্ষা বুঝেন না;— তাঁহারা বুঝেন এই "চাওয়ার" অর্থ উদ্যমপূর্ণ অদম্য সাহস ও কার্য্যকুশলতা।

জিজিভাই ও পেভিতের দৃষ্টান্ত দুইটি অতি বিখ্যাত দুইজন স্বনামধন্য পুরুষ। তাঁহাদের ন্যায় লক্ষ লক্ষ টাকা আয়ের আশা সকলেই করিতে পারে না সত্য; কিন্তু অদম্য চেষ্টায় উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, তাঁহাদের চরিত্র হইতে ইহাই আমরা শিখিতে পারি। তাঁহারা যদি কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিয়া থাকেন, তবে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা লক্ষ লক্ষ, হাজার হাজার বা শত শত টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবেনা কেন? এমন অনেক জীবিত ব্যবসায়ীরও নাম করা যায়, যাঁহারা সামান্য অবস্থা হইতে ক্রমশ উন্নতির সোপানে উঠিয়াছেন। তাঁহাদের আর প্রত্যেকের নাম করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আজও এমন একজন ধনী ব্যক্তির নাম করিতে পারি, যিনি একজন গরুর-গাড়ীচালকের পুত্র; এবং যিনি কুলি হইয়া প্রথমে জীবিকা সংগ্রহ করেন। তিনি যখন কুলি ছিলেন, তখন তাঁহাকে বনে যাইয়া জ্বালানী কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে হইত, এবং তাহা বহন করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে হইত। এইরূপ কুলিগিরি করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া তিনি সাল সেগুণ প্রভৃতি কাঠ কাটিবার জন্য কন্‌ট্র্যাক্ট লইলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি একটি জঙ্গল নিজের করিয়া ফেলিলেন, এবং কুলি ও ছুতার খাটাইয়া কতরূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করাইয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। আজ তিনি সুখময় বৃদ্ধ বয়সে খুব বড় অট্টালিকা ও অনেক জমী জমা ও

যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়া আমোদে দিন কাটাইতেছেন। যিনি ১৯০৩।৪ সালে মান্দ্রাজ প্রদর্শনীতে দ্রব্যাদি প্রদর্শকগণের সহিত বা তাঁহাদের অধীন ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীগণের সহিত আলাপ করিয়াছেন, তিনিই জানেন, কত শত ব্যবসায়ী ছুতার, চাবি-প্রস্তুতকারী, কামার, গোয়ালা, চর্ম্ম-ব্যবসায়ী সাবান-প্রস্তুতকারী, বাতি-প্রস্তুতকারী প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণ অতি ক্ষুদ্রভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়া শেষে কত উন্নতি করিয়াছেন ও তাঁহাদের অদম্য চেষ্টায় কেমন সুখময় পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বাণিজ্য-রাজ্যে উন্নতির যথেষ্ট স্থান এখনও পড়িয়া আছে। কিন্তু ব্যবসায়ীগণের বেশ বুঝিয়া রাখা দরকার যে, ব্যবসায়ে উন্নতি একদিনের চেষ্টায় হয় না, উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়, অনেক কাঁটাবন ভাঙ্গিতে হয়। যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ হস্তে রাখিয়া অদম্য সাহসে কার্য্যে অগ্রসর হও, দেখিবে উন্নতি-সূর্য্য আপনিই তোমায় দেখা দিবেন। ভাগ্য-লক্ষ্মী তোমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হইবেন।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

# দম্পতীর পত্রালাপ।

## ( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

এখন গ্রন্থকারের ধর্ম্মতত্ত্বের কথা কিছু বলিব। গিরিজাপ্রসন্ন যৌবনের প্রথম স্তরে পদার্পণ করিয়াই তাহার হৃদয়ে ধর্ম্ম-বীজ অঙ্কুরিত করিয়াছিলেন। প্রথমে সেই অনন্তশক্তিমান জগদীশ্বরের অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস, তৎপর তাহার তৎপ্রতি আত্ম-নির্ভর জন্মিয়াছিল; কাজেই তাহার সকল পুস্তকেই আধ্যাত্মিক বিষয় অধিক স্থান পাইয়াছে, সে সব কথা যদি ভগবান কৃপা করেন, তবে একদিন বলিতে চেষ্টা করিব।

আমরা চপলার একাকিনী পথিমধ্যে ভগবানের প্রতি সকরুণ রোদন, ও তাহার বিপদ উদ্ধারের জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনার ফল-ভৈরবী-সন্দর্শন ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলাম। গ্রন্থকার এইস্থানে এই সার নীতি-শিক্ষা দিলেন।

( ক ) আশ্রয়-হীনা হইয়া যদি কায়-মনোবাক্যে ভগবানকে চিন্তা করা যায়, ও কোনও সদিচ্ছা পূরণের জন্য তাঁহাতে আত্ম-বিসর্জ্জন করা যায়, তাহা হইলে পরম-কারুনিক মঙ্গলময় ভগবান সেই ইচ্ছা পূর্ণ করেন।

চঞ্চলার সেই সকল আর্ত্তনাদের ফলে তাহার বিপদ মোচনের জন্ত আশ্রয়-বিহীন পথিমধ্যে হঠাৎ ভৈরবীর সন্দর্শন ঘটিল। যেন ভগবান-কর্ত্তৃক ভৈরবী চঞ্চলার বিপদ মোচনের জন্ত প্রেরিত হইয়াছিলেন। ঈশ্বর-নিষ্ঠ ব্যক্তিই এই রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম। গ্রন্থকার আর এই চঞ্চলার চরিত্রে আর একটী দৈববলের অলৌকিক ক্ষমতা পরিস্ফুটিত করিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছেন। চঞ্চলা স্বামী-গৃহ-পরিবর্জ্জিত হইয়া যখন ভৈরবী-সন্দর্শন করেন, তখন ভৈরবী চঞ্চলাপ্রমুখাৎ তাহার স্বামী-বিচ্ছেদ তত্ত্ব অবগত হইয়া কিছুদিন তাহার সঙ্গে বাস করিতে চঞ্চলাকে পরামর্শ প্রদান করেন। কিন্তু চঞ্চলা ভৈরবীর নিকট ঈশ্বর তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক উপদেশ পাইয়াও শান্তি অনুভব করিতে পারিতেন না। স্বামীকে বিস্মৃত হইয়া ভগবানের চিন্তায় তিনি তৎপর থাকিতে পারিলেন না। তিনি একদিন স্বামী-বিরহে ও তাহার মঙ্গল সংবাদ শ্রবণে অধীরা হইয়া ভৈরবীকে নরেন্দ্রনাথের সংবাদ আনিতে সহরাভিমুখে পাঠাইলেন। চঞ্চলা নরেন্দ্রনাথের জন্য এত উদ্বিগ্ন হইলেন যে, চিত্তস্ফূর্ত্তিকর ভগবৎ বিষয়ক সঙ্গীত-চর্চ্চায ও সেদিন শান্তি পাইলেন না। তখন চঞ্চলা ঊর্দ্ধকরে সেই বিপদ-ভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলেন :—

"কোথায় তুমি নারায়ণ, মধুসূদন শরণাগত পরিত্রাণ পরায়ণ, কোথায় তুমি, আমার মন আজ এমন অস্থির হইল কেন? হরি হে! শালগ্রাম ঠাকুর, হে জনার্দ্দন, আমার ভয় নিবারণ কর—যদি তিনি কোনও বিপদে পড়িয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে উদ্ধার কর।

কিছুকাল পরে ভৈরবী প্রত্যাগত হইলেন. চঞ্চলা ভৈরবীর মুখশ্রী দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন তাহার স্বামীর কোনও বিপদ ঘটিয়াছে। চঞ্চলা তখন জিজ্ঞাসা করিলেন. "কি খবর দিদি, তাহার দেখা পেলে? তিনি ভাল আছেন ত? তাঁহার ত কোনও বিপদ ঘটে নাই? আমার অষ্টমপ্রহর এখন কেবল সেই ভয়ই হইতেছে, এমন কেন হইল দিদি?" ভৈরবী এ প্রশ্নের কি উত্তর করিবেন স্থির করিতে পারিতেছিলেন না, তাঁহাকে মৌনী দেখিয়া চঞ্চলা পুনরায় বলিলেন :—

বল না দিদি—যাহা হইযাছে. খুলিয়াই বল, এ কপাল যে ভাল নহে, তাহা ত জানিতেছি। তারপর মনটা যখন এত উথলা হইতেছে, তখন একটা না একটা কিছু ঘটিয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি। তুই আমার কষ্ট বাড়াস্ না—তুই খুলে বল কি হইযাছে।

ভৈরবী তখন গম্ভীরভাবে নরেন্দ্রনাথ-সম্বন্ধীয় যাবতীয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন।

আমরা দেখিলাম. চঞ্চলা ভৈরবী-সন্দর্শনে আসিয়া অন্য কোনও সুখ দুঃখের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল পতি ধ্যানেই নিমগ্না। চঞ্চলা স্বামীত্যক্তা হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার অন্তরখানি যেন নরেন্দ্রনাথের নিকট আবদ্ধ ছিল। চঞ্চলার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি

যেন নরেন্দ্রনাথের তত্ত্ব অন্বেষণে নিয়োজিত হইয়াছিল। এরূপ কাহারও প্রতি একাগ্রতা জন্মিলে, মানুষের মানসিক শক্তি এত প্রবল হয় যে, যাহার দিকে মন প্রাণ নিয়োজিত থাকে, অনায়াসেই তাহার সম্বন্ধে একটা ভাল মন্দ সংবাদ মনের সাহায্যে জানিয়া লইতে পারা যায়। এই একাগ্রতাই যোগের অঙ্গ। চঞ্চলার মন নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এত অভিনিবিষ্ট ছিল যে, চঞ্চলাও নরেন্দ্রনাথের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে মনের সাহায্যে একটা ধারণা করিতে সমর্থ হইলেন। এবং যখন ভৈরবীর নিকট হইতে নরেন্দ্রনাথ বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, তখন তাহার যোগমগ্ন চিত্তের উত্তরের সঙ্গে ভৈরবীর কথা মিলিয়া গেল। আমরা তখন চঞ্চলার এই এক নিষ্ঠ-যোগের ফল চঞ্চলার চরিত্রে দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। এবং চঞ্চলার হৃদয়টী নির্ম্মাণ কৌশলের জন্য গ্রন্থকারকে অশেষ ধন্য-বাদ প্রদান করিলাম।

চঞ্চলা প্রথমতঃ স্বামীর উৎকোচ-জনিত পাপের ফলে কারাদণ্ড হইবে, এই উৎকট চিন্তায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া ছিলেন, কিন্তু ভৈরবীর কৃপায় চৈতন্য সম্পাদিত হইল। ভৈরবী আশাপূর্ণ বাক্যে চঞ্চলাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন "এখনও সময় আছে, এখ-নও জজসাহেব রায়প্রকাশ করেন নাই, এখ-নও দৈবানুষ্ঠানে, তাঁহার ভাল করা যায়। চঞ্চলা ঈশ্বরে সম্পূর্ণ বিশ্বাসবতী। কাজেই দৈববলে যে এ সংসারের বিধি পরিবর্ত্তিত হয়, তাহাতে যেন চঞ্চলার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মি-য়াছিল। পরদুঃখ কাতরা ভৈরবী ও তৎ-সম্পাদনে স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়া, অরণ্যের নিভৃত স্থানে এক মহাপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি-লেন, এবং নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সমস্ত ব্যাপার তাঁহার কর্ণগোচর করিলেন। আরও বলি-লেন-আজ চঞ্চলার কষ্টে তিষ্টিতে পারিলাম না। নরেন্দ্রনাথের শাস্তি হইলে চঞ্চলা বাঁচিবে না। মহাপুরুষ এই কথায় অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন, "আমি তাঁহার কি করিব মা—যে যাহার নিজের কর্ম্মফল ভোগ করিবে, আমি তাহার কি করিব মা"।

ভৈরবী। তাহা শুনিব না—দৈবের অসাধ্য ব্যাপার নাই। যে বিধিবলে সংসার চলে, দৈববলে সে বিধিত অতিক্রম করা যায়, ইহা শুনিয়া আপনিই মহাপুরুষ ভ্রুকুঞ্চিত করি-লেন। দেখিয়া ভৈরবী ভীত হইলেন। পরে, পুনর্ব্বার বিকট হাস্য করিয়া বলি-লেন—"তাই হইবে, নরেন্দ্রনাথ মুক্ত হই-বন।" কিন্তু চঞ্চলার অদৃষ্টে আরও কিছু ভোগ আছে।

প্রকৃত ঘটিলও তাহাই, নরেন্দ্রনাথ মহা-পুরুষের কল্যাণে দৈববলে উদ্ধার লাভ করি-লেন। এইস্থানে গিরিজাপ্রসন্ন আমা-দিগকে কি শিক্ষা দিবেন?

(খ) সর্ব্বদা ঈশ্বরকে ভক্তি করিবেন ঈশ্বরই বিপদ মোচনের জন্য একটী অলৌ-কিক ঘটনা সৃষ্টি করিয়া, তাঁহার প্রেরিত কোনও মহাপুরুষ দ্বারা বিপদপতিতজনের বিপদ মোচন করেন।

চঞ্চলা ভগবানে শ্রদ্ধাপরায়ণা ছিলেন বলিয়াই নিতান্ত বিপদের মধ্যে পড়িয়া, আশ্রয়স্বরূপ ভৈরবী সন্দর্শন করিতে সমর্থ

হইয়াছিলেন। এবং তদ্দারা স্বামীর উৎকট বিপদবশ সহজেই দূর করিতে পারিয়াছিলেন। প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর কার্য্য—বলত পাঠক! চঞ্চলা ধর্ম্মপরায়ণা না হইলে কি সম্পাদন করিতে পারিতেন?

দ্বিতীয় নীতি দ্বারা গ্রন্থকার কি শিক্ষা দিলেন?

( গ ) যে বিধির বলে সংসার চলে, দৈব-বলে সে বিধিও অতিক্রম করা যায়।

চঞ্চলা ঈশ্বর নিষ্ঠ, সুতরাং তাহার বিপদও ঈশ্বর কর্ত্তৃক তিরোহিত হইল। চঞ্চলা ঈশ্বরের অনুগ্রহ—যে অনুগ্রহলাভের জন্য বিষয় বাসনা তুচ্ছ করিয়া স্বামীর অপ্রিয় পাত্রী হইয়াছিলেন, সেই অনুগ্রহ লাভ করিয়া স্বামীকে বিপদশূন্য করিলেন।

চঞ্চলা, তুমি এই ভারতবর্ষের আর্য্য রমণী। তোমাদ্বারা যে একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটিল, আমরা তাহাতে বিস্ময়াপন্ন হই নাই। কারণ প্রাচীনকালে তোমার ন্যায় অনেক রমণী এদেশে এরূপ অলৌকিকত্ব দেখাইয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা সেরূপ বীর্য্যবতী ধর্ম্মপরায়ণা রমণী আজ কালকার হিন্দুর ঘরে বিরাজিত দেখিতে পাই না। তুমি বহুকাল পরে আমাদের দেশের পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া দিতেছ। আমরা যতই তোমার চরিত্র আলোচনা করি, ততই যেন হৃদয়ে আলো, দেহে বল, প্রাণে শক্তি লাভ করিয়া সঞ্জীবিত হই। তোমার ন্যায় সংসারে নিষ্কামী গৃহিণী, তোমার ন্যায় সংসারে সহধর্ম্মিণী, তোমার ন্যায় সংসারে তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ রমণী বিদ্যমান থাকিলে, এ পতিত ভারত সন্তানের অনেক মঙ্গল হইবে। তাই বলি চঞ্চলা, ভারতবর্ষের রমণীরা তোমাকে যেন আদর্শ ধরিয়া এ মায়া মোহ ময় অনিত্য সংসারে যাহা কিছু কর্ত্তব্য শিখিয়াছেন। এমনএকদিন আসিবে, যখন তোমার মতই এ ভাবতে সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত অসংযমী ভারত সন্তানের নিকট শ্রেষ্ঠমত বলিয়া প্রসংশিত হইবে।

একাদশ পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার নরেন্দ্রনাথের প্রথম প্রায়শ্চিত্ত দেখাইয়াছেন। নরেন্দ্র দৈব বলে কারাদণ্ডের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া সেই দিনই চঞ্চলাকে হৃদয়ে স্থান দিতে বাধ্য হইলেন! সাধ্বী চঞ্চলা যদিও স্বামীর অগোচরে, অজ্ঞাতে তাহার মহা ইষ্টসাধন করিয়া ছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মের একটা কি বিচিত্র লীলা, সেই সৎকার্য্যের প্রতি দান দেওয়ার জন্য ও উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারের জন্য কে যেন চঞ্চলার মূর্ত্তিখানি তাহার হৃদয়ে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করাইয়া দিল। চঞ্চলা ধর্ম্মের পুরস্কার পাইলেন। নরেন্দ্রনাথ নৃত্যগীত ও আহারাদির প্রচুর বন্দোবস্ত করিয়া বৈঠকখানায় আসিয়া বিশ্রাম করিতে বসিলেন, ধীরে ধীরে চঞ্চলার স্মৃতি আসিয়া নরেন্দ্রনাথের হৃদয়পটখানি আবৃত করিয়া বসিল। নরেন্দ্রনাথ সেই স্মৃতি পরিহার করিয়া নৃত্যগীত সুখে মন ভাসাইতে চাহিলেন, কিন্তু বিফল মনোরথ হইলেন। নির্দ্দয় নরেন্দ্রনাথ একদিন তুমি ধার্ম্মিকা চঞ্চলাকে ঈঙ্গিত করা মাত্র, তোমার গৃহ ছাড়িয়া তিনি বনবাসিনী হইয়াছিলেন আজ কেন তাহার চিন্তা দূর করিতে তোমার বহু আয়াস পাইতে হইতেছে।

নরেন্দ্রনাথ অশ্রুমোচন করিলেন. তাহার দীর্ঘনিশ্বাস বহিতে লাগিল। এই মর্ম্ম-পীড়াই তাহার পাপের প্রথম প্রায়শ্চিত্ত। নরেন্দ্রনাথ ভাবিতে লাগিলেন—কোথাও সন্ধান পাইলাম না, তবে কি সে নাই? নির্দ্দয় নরেন্দ্রনাথ আবার বলপূর্ব্বক চঞ্চলার স্মৃতি হৃদয়মূল হইতে উৎপাটিত করিয়া হাসিতে হাসিতে ভাবিতে লাগিলেন :—

"যাহাদের চিত্ত দুর্ব্বল. যাহাদের চিত্ত উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় নাই. তাহারাই পৃথিবীতে কতকগুলি কার্য্যকে অধর্ম্ম মনে করিয়া ভীত হয়, সকল বিষয়েরই শিক্ষা আবশ্যক। নীলকণ্ঠের কণ্ঠশোভা, অপরের নিকট হলাহল, সমাজ-নিন্দিত কার্য্যানুষ্ঠান অশিক্ষিত লোকের যন্ত্রণাদায়ক, যে শিক্ষিত তাহার পক্ষে সকলই সমান।

এখন নরেন্দ্রনাথের হৃদয়খানির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। নরেন্দ্রনাথ কারাদণ্ডের প্রাণান্তকর যন্ত্রণাভোগ করে নাই, কিন্তু তাহার নিজকৃত অপরাধের জন্য যখন অনুশোচনা বাণ মুহুর্মুহু কোমল হৃদয়খানির উপর পতিত হইয়া ক্ষত বিক্ষত হয়, তখন সে যন্ত্রণা কি কারাগারের দণ্ড অপেক্ষা লঘু বোধ হয়? তিনি চঞ্চলার নিকট অপরাধি, চঞ্চলা নিকটে নাই। নরেন্দ্রনাথ যখন উৎকট অশান্তির তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইতে থাকেন, অশান্তির অগণিত স্তুপরাশি যখন মনটাকে প্রহত করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিতে থাকে, নরেন্দ্রনাথ তখনই যেন সেই উৎকট যন্ত্রণাহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার নিমিত্ত অসার ও ক্ষণিক একটা সুখে মনটা ভাসাইয়া কিয়ৎকালের জন্য শান্তি অন্বেষণ করেন।

গিরিজাপ্রসন্ন এই প্রথম নরেন্দ্রনাথের পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেখাইতেছেন। আমরাও নরেন্দ্রনাথের ভোগসুখের উপকরণের মধ্যে নরেন্দ্রনাথকে বিষণ্ণ দেখিয়া তাহার অশ্রুপতন অবলোকন করিয়া বুঝিলাম নরেন্দ্রনাথের বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে আভ্যন্তরিক অবস্থায় সৌসাদৃশ্য নাই। নরেন্দ্রনাথ আজ এ জগতে প্রকৃতই অসুখী। তাহার অশান্তির সীমা নাই। নরেন্দ্রনাথ এখন মুখে হাসি ফুটান কেবল দুঃখ ঢাকিয়া রাখিবার জন্য। এই অবস্থায় লোক বড়ই যন্ত্রণা ভোগ করে। গিরিজাপ্রসন্নও কৌশলে, নরেন্দ্রনাথের হৃদয়স্থিত বৃশ্চিকদংশনবৎ জ্বালা দুই একটা কথা দ্বারা ঘটনার সাহায্যে বেশ বুঝাইয়া দিলেন। এখানে তাহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য বিকাশ হইয়াছে। আমরা ইহা দ্বারা কি নীতি শিক্ষা করিলাম।

(খ) পাপকার্য্য করিয়া তাহার অনুশোচনার হস্ত হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য অন্য একটী পাপ বিষয়ে মন নিয়োজিত করিয়া মনকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করা বৃথা,. এমন একটা সময় পাপীর উপস্থিত হয়, যখন ভস্মাচ্ছাদিত অনলশিখার ন্যায় উৎকট তাপানল আমোদ প্রমোদের ভিতর হইতে ক্ষণে ক্ষণে জ্বলিয়া হৃদয়খানি দগ্ধ করিয়া ফেলে। নরেন্দ্রনাথ যন্ত্রণায় এত মুহ্যমান যে, সেই যন্ত্রণা হৃদয় হইতে দূর করার জন্য বাহ্যিক আড়ম্বর দ্বারা অন্তরের কালিমা ধৌত করিতে চেষ্টা করিলেন। এবং নিতান্ত

অসমর্থ হইয়া মনকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিলেন।

"যাহাদের চিত্ত দুর্ব্বল তাহারাই পৃথিবীর কতকগুলি কার্য্যকে অধর্ম্ম মনে করিয়া ভীত হয়"।

এসব কথা কি কেবল মনপ্রবোধ দেওয়ার কথা নহে? যে কথা মিথ্যা, তাহা ঘটনাক্রমে সময় বিশেষে প্রমাণীত হইয়া যায়। নরেন্দ্রনাথ অলীক চিন্তা দ্বারা হৃদয়টাকে প্রকৃতিস্থ করিতে চাহিলেন বটে, কিন্তু ভগবানের বিচারে তাহার পরাজয় হইল। গ্রন্থকার একটা জড় প্রকৃতির ভীষণ ভাবদ্বারা নরেন্দ্রনাথের সমস্ত অপরাধ তাহার কণ্ঠ দিয়া বাহির করিয়া দিলেন। সেই দিনই তন্মুহূর্ত্তে দৌলতখাঁর দিগন্তগ্রাসী হৃদয় বিদারক প্রবল বন্যা আরম্ভ হইল।

সহ-সম্পাদক।

# সঙ্গীত।*

(১)

কেন এ বিরহগীতি গাহিয়া বেড়াও তুমি
স্বরগ সম্ভব
পরের দুঃখেতে ভুলি, গাও কি হৃদয় খুলি
জুড়াইতে অভাগার তাপিত অন্তর?
(সম দুঃখে সাধুচিত সদাই কাতর)।

(২)

কোমল শরীর তব পড়েগো ঢলিয়ে
দেখি পরদুঃখে
তাই কি অমন করি, বলিতেছ ধীরি ধীরি
বিষাদের অস্ফুটন্ত মধুর ভাষায়
সদা কাঁদে পোড়া মন তোদের ব্যথায়।

(৩)

অশ্রুজল জমাইয়ে গড়িলা কি তব
নিরমল-চিত
দুঃখের কিরণ গায়, লাগিলে গলিয়ে যায়
তরল স্ফটিক রাজি স্বচ্ছ সরোবর
ফলাইতে বিষাদের মূরতি সুন্দর।

(৪)

তাই কি নিরাশ-শ্বাসে গায়ে যদি লাগে তব
সলিলের রাশি

---

* এই কবিতাটী লেখকের একখানি অতি প্রাচীন নোট বুকে প্রাপ্ত হইয়াছি, এ পর্য্যন্ত ইহা অপ্রকাশিত ছিল। আমরা কবিতাটীর ভাবাতিশয্য ও উপমান উপমেয়র বিচিত্র সংঘটনে মুগ্ধ হইয়া কবিতাটী প্রকাশ করিলাম। ৺ গিরিজাপ্রসন্ন বঙ্গ সাহিত্য সেবীর নিকট গদ্য-রচনাকুশল বলিয়া আদৃত, তিনি এই পদ্যটী রচনায় কিরূপ চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, পাঠকবর্গ মনঃসংযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে বিদিত হইবেন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা, করি কি মধুর খেলা
ঐ উহার গায়ে ঢলি ভাসিয়ে বেড়ায়
পরের দুঃখেতে সদা অস্থির হৃদয়।

( ৫ )

সংসারের দুঃখ দেখি চাহ কি করিতে তুমি
আপন আলয়
তাই ও বিষাদ স্বর ক্রমে ক্ষীণ কলেবর
মিলায় আপন তনু আকাশের গায়—
যাইতে সে সুখ-স্থানে নিবাস যথায়।

( ৬ )

শুনিয়াছি সত্ত্বগুণে তমোগুণ যবে
করয় প্রবেশ
বাড়বানলের প্রায়, সে বড় ভীষণ হয়
জগতের রীতি এই— গুণের স্বভাব
দ্বিগুণিত করি যেন পূরায় অভাব।

( ৭ )

তাই কি ও ক্ষীণ-দেহে এত শক্তি ধর
অত্যাচার দেখি
উপহাসি বজ্রস্বরে, ন্যায়ের পতাকা ধরে,
আগু হও, কাঁপাইয়ে বৈরীর অন্তর
তুচ্ছ করি মৃত্যু ভয়—স্থির কলেবর।

( ৮ )

দুটি তোমার ভাব লাগে বড় মনে মোর
প্রাণ-স্নিগ্ধকর
দুঃখি পর দুঃখে যবে, আশ্বাসিতে পরজীবে
আবাহন কর তুমি স্বরগের স্বর
শীতলিতে নিরাম্নার দগ্ধ কলেবর।

( ৯ )

শুনি ও বিষাদমাখা সুমধুর স্বর তব
মোহে এ পরাণ
আপনা ভুলিয়ে যায়, তোমাতে মিশাতে চায়
তাই করি মোক্ষজ্ঞান—বিমুগ্ধ অন্তর
এতই মোহন মন্ত্র জান যাদুকর।

( ১০ )

শুনি সেই প্রণয়ের আলাপ তোমার
শ্রবণ তোষণ—
উদাস হইয়ে যাই, সংসার ভুলিতে চাই
জড়বৎ সুখনীর করি সন্তরণ—
সাগর বক্ষেতে ক্ষুদ্র তরণী যেমন।

( ১১ )

কেমনে যে শূন্য হয়ে পড়ে এ হৃদয়
কেমনে বলিব
তোমার স্বরের সনে, বেড়ায় আনন্দমনে
শূন্য মনে শূন্য হ'য়ে পাগল হৃদয়
করি জীবনের কাজ শুধু স্বরময়।

( ১২ )

পূরবের সুখ স্মৃতি উঠয় জাগিয়া
প্রাণ বিমোহন
প্রিয়জন প্রেমকথা জানিনা কি সূত্রে গাঁথা
তোমার স্বরের সনে সুখের জীবন
এদেরো কি উপাদান তোমার যেমন।

( ১৩ )

আরো এক ভাব তব চির সহচর
অভিন্ন-হৃদয়
যেখানে তোমায় দেখি, জুড়ায় হৃদয় আঁখি
দেখিবারে পাই সদা ভকতি যথায়
প্রশান্ত গম্ভীর বেশ চিত প্রেমময়।

( ১৪ )

বেশ কি বলিব আর যা কিছু যথায়
আছে প্রেমময়

কোমল মুখেতে মাখা,—ধরম হৃদযে আঁকা
সে সকল তবাধীন রাজরাজেশ্বর
কাহার রাজত্ব এত মনের উপব ?

( ১৫ )

আরো একভাবে তব চুমে এ অন্তর
বীপরীত ভাব
ধরি জীমূতের স্বর, স্বাধীনতা কলেবব
বীরমদে বীব মন মাতাও যখন
শিরাতে শিরাতে করি রক্ত সঞ্চালন।

( ১৬ )

শুনেছি পারহ তুমি কবিতে ইচ্ছায
জলাগ্নি বর্ষণ—
যে বা বলে সে কথায় অবিশ্বাস, আমি তায়
নাহি পারি করিতে কথন
এত কি চেতসার শূন্য জড়ের জীবন ?

( ১৭ )

ছিল এ বাসনা, ফুলফল দিযে পূজি
ও রাজীব পদ
তোমার সাধনা করি, সাধিব দযাল হরি
মিলাইব এ শরীব—শরীরে তোমার
কিন্তু না পূরিল বুঝি বাসনা আমার।

৺গিরিজা প্রসন্ন রায় চৌধুরী।

## ঘোষাল পুকুর।

( ১ )

টল টল কালো জলে ভবা,
সারি সারি তাল গাছ পাড়ে,
কেনা চেনে ঘোষাল পুকুর
গ্রামে যেতে রাস্তার ধাবে।

( ২ )

সকালে বিকালে বাঁধা ঘাটে
রাখাল বালক কবে খেলা,
পাকা তাল কুড়াবার লাগি
ব'সে ছেলেদের মধু-মেলা।

( ৩ )

একদিন দুটী পাকা তাল
শিশু এক কুড়াইয়া পায়,
আর শিশু হাত হতে টানি
সবলে কাড়িয়া নিতে চায়।

( ৪ )

না পারিয়া বলে কেড়ে নিতে
বালক বলিল বার বার,
"পুকুব হয়েছে আমাদের
জানিস্ তোদের নাহি আর।"

( ৫ )

তাল দুটী এতক্ষণ ধরি
বুকে চাপি রেখেছিল 'মণি'
নামায়ে রাখিল ধীরে
শুধু এই দুটী কথা শুনি।

( ৬ )

জননী দাঁড়ায়েছিল দূরে
কাছে গেল শিশু ম্লানমুখে,
প্রথম বিক্রয় ব্যথা পুনঃ
জাগিলবে জননীর বুকে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ,।

# বিফল।

দীপ জ্বালি বসে আছি, পূর্ণ আয়োজন,
বিল্বদল, নবদূর্ব্বা, পুষ্প অর্ঘ লয়ে,
গললগ্নীকৃতবাসে যুড়ি দুটী কর
নির্নিমেষে প্রতিমার পানে আছি চেয়ে।
সহসা বহিল বায়ু নিবাইল আলো
উড়াইল ফুল, দিল অর্ঘ্য ছড়াইয়ে;
শান্ত প্রাণ চিন্তাবেগে হ'ল আলোড়িত,
বিত্রস্ত, পূজার ভান গেলরে ভাঙ্গিয়ে!
কে গড়ে, কে ভাঙ্গে, কেবা দেয় হৃদে ব্যথা,
ভীমবায়ু, কালমেঘ, কার তরে হেথা।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র মুখোধ্যায় বি, এ।

# সামাজিকতা।

সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর, প্রাণীগণের আবাসস্বরূপ, এই পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবীতে নানা জাতীয় জীবজন্তু আছে। সকল জীবজন্তুর স্বভাব বা অবস্থা সমান নহে। কতকগুলি জীব অতি বিস্তীর্ণ বনেই থাকিতে ভালবাসে; অভ্রভেদী জীর্ণবৃক্ষে আবৃত লতাগুল্মে আচ্ছন্ন নিবিড় বনই তাহাদের পরম সুখের আলয়। কতকগুলি জীব অতলস্পর্শ গভীরজলে থাকিতে ভালবাসে; দূরবিস্তৃত গভীর সমুদ্র বা দূরবাহিনী নদনদীই তাহাদের প্রধান আরামস্থল, এবং কতগুকলি জীব ইচ্ছামত কখন জলে, কখন বা স্থলে, উভয় স্থানেই থাকিতে ভালবাসে; জলচরসঙ্কুল জল ও স্থলচর পরিপূরিত স্থল, উভয়েই তাহাদের সমানরুচি। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর পৃথিবীতে জলচর, স্থলচর ও উভয়চর এই ত্রিবিধ জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই তিন প্রকার জীব তাঁহার বিশ্বরাজ্যের প্রজাস্বরূপ।

মনুষ্য সকল জীবের প্রধান। মনুষ্যকে

সকল জীবের রাজা বলিলেও বলা যায়। মনুষ্য ইচ্ছা করিলে, অতি দুরন্ত বনহস্তিকেও পিঞ্জরবদ্ধ করিতে পারেন, ও সহস্র সহস্র সহচরের মধ্যস্থিত অতি ভয়ানক দুর্দ্ধর্ষ বনব্যাঘ্রকেও আক্রমণ করিতে ভীত হন না। মনুষ্যকে কেবল স্থলচর না বলিয়া, সর্ব্বচর বলিলে বলা যায়। মনুষ্য বিমানেও আরোহণ করিতে পারেন, এবং অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া, অবলীলাক্রমে সন্তরণপটু বড় বড় জলচরকেও পরাজিত করিয়া দুস্তর সাগর সকল উত্তীর্ণ হইতে পারেন। মনুষ্য ও ইতরজন্তুর স্বভাব অনেক বিভিন্ন বটে; কিন্তু কতকগুলি বৃত্তি প্রায় সকল জীবের সমান। এই নিমিত্তে কতকগুলি বিষয়ে প্রায় সকল জীবজন্তুকেই সমান দেখিতে পাওয়া যায়।

আসঙ্গলিপ্সা সকল জীবজন্তুরই সমান। সকল জীবজন্তুই স্বজাতীয়কে লইয়া একত্রে থাকিতে ভালবাসে। হস্তীরা মিলিয়া একটী পরাক্রমশালী হস্তীকে আপনাদের দলপতি করে। তাহারা তাহাকেই অবলম্বন করিয়া নির্ভাবনায় পরম সুখে একত্রে সহবাসসুখ অনুভব করিতে থাকে। আহার বা বনবিহারের ইচ্ছা হইলে, তাহারা সকলে একত্র না হইয়া, কোথাও যায় না, বিপদ উপস্থিত হইলে, একত্র হইয়া সকলেই তাহার উপায় উদ্ভাবন করে। প্রসিদ্ধ পর্য্যটকেরা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। চক্ষে দেখিতে পাইলে, কেহ শুনিতে চাননা,এ নিমিত্তে আমরা ইতর জন্তুগণের আসঙ্গলিপ্সার একটী গ্রাম্য উদাহরণ দিতেছি। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে মৎস্যসকল জলাশয়ে ভাসমান হয়। ভাসিবার সময় সকল মৎস্যই একবারে ভাসিয়া উঠে, সন্তরণ দিবার সময় সকলেই একবারে সন্তরণ দেয়, আবার জলমগ্ন হইবার সময় সকলেই একবারে জলমগ্ন হয়। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয়, একত্রবাসবিষয়ে সকল জীবজন্তুরই স্বভাব একপ্রকার।

আসঙ্গলিপ্সা অপর জীব অপেক্ষা মনুষ্যের অধিক বলবতী। এ নিমিত্তে মনুষ্য কখন একাকী থাকিতে ভালবাসে না। নির্জ্জন বাসের দুঃখ ও একত্র বাসের সুখ বর্ণন করিবার এ স্থান নহে। ফলতঃ বন্দি, চিরপ্রবাসী প্রভৃতিগণের অবস্থা দেখিয়া সকলেই ইহা সহজে অনুভব করিতে পারেন। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর, মনুষ্যের মনে এই বৃত্তি দিয়া পৃথিবীকে কি সুখের ও স্বচ্ছন্দের স্থান করিয়াছেন, বলা যায় না। ইহা না থাকিলে, গৃহস্থজনসুশোভিত পল্লী, গ্রামীণজনপরিপূরিত গ্রাম, ও বহুজনাকীর্ণ শোভনতম প্রাসাদরাজিরঞ্জিত নগর কখন দৃষ্ট হইত না। রাজধানী, নগর, উপশল্য প্রভৃতির কার্য্য কিছুই হইত না। পরমেশ্বরের অচিন্ত্য ও অনির্ব্বচনীয় শক্তির প্রমাণস্বরূপ শাস্ত্রসকলেরও আবিষ্কার হইত না। এই আসঙ্গলিপ্সাই মনুষ্যের সুখের ও আনন্দের মূলীভূত কারণ।

স্বতন্ত্রতা সকল দুঃখের মূল। স্বতন্ত্র ব্যক্তি কখন সুখ ও সচ্ছন্দ লাভ করিতে পারেন না। পরমেশ্বর আমাদিগকে বাক্শক্তি দিয়াছেন; কাহারো সঙ্গে কথাবার্ত্তা না কহিয়া থাকিতে পারা যায় না। মূর্খের

মতন নিঃশব্দে বসিয়া থাকিতে আমাদের ইচ্ছা হয় না। মনের তৃপ্তি বা তুষ্টিও জন্মে না। মনুষ্যসমাজই আমাদের এ বাসনাসিদ্ধির প্রধান উপায়। মনুষ্যসমাজে বাস ব্যতীত কথাবার্ত্তা কহিয়া সুখী হইবার আর অন্য উপায় নাই। যখন কোন গৃহস্থের জীবন-সর্ব্বস্ব একমাত্র পুত্রের অকালে মৃত্যু হয়, আর তাহার শোকে পিতামাতা, ভ্রাতাভগিনি প্রভৃতি ব্যাকুল হইয়া, পাগলের মত শুষ্ককণ্ঠে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করে, তখন প্রতিবাসী বই সান্ত্বনা আর কে করিতে পারে? তখন সেই প্রতিবাসীদের অকপট স্নেহ ও যত্নই তাহার জীবন রক্ষার কারণ হইয়া উঠে। স্বতন্ত্র ব্যক্তি কখন আপনার বিপদসময়ে এরূপ সমাজসুখ অনুভব করিতে পারেন না। সামাজিকেরাই এই সকল অনির্ব্বচনীয় সুখের অধিকারী। পরমেশ্বর কাহাকেও সম্পন্ন বা সর্ব্বক্ষম করিয়া দেন নাই। একটী মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী যত দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, একটী মনুষ্য কিছু একাকী তত দ্রব্যের আয়োজন করিতে পারে না। বহু পরিশ্রমেও ইহা সাধ্য হইবার বিষয় নহে। এ নিমিত্ত একত্রে থাকিয়া, কতকগুলি ব্যক্তিকে ক্ষেত্রে হলচালনা পূর্ব্বক কৃষিকার্য্য করিতে হয়, কতকগুলিকে বস্ত্রবয়ন ও বস্ত্রসীবন করিতে হয়, কতকগুলিকে শাস্ত্রের উন্নতি ও গ্রন্থাদি রচনা করিতে হয়। এরূপ না করিলে, সকলের সকল বিষয় সুখে সম্পন্ন হয় না। এই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে, আবহমান কাল অবধি, মনুষ্যসমাজ নিয়মিত, সংস্কৃত ও উন্নত হইয়া আসিতেছে।

মনুষ্যসমাজ বড় সাধারণ সমাজ নহে। কোন একটী কল্যাণকর অনুষ্ঠানের নিমিত্ত একটী ক্ষুদ্র সমাজ সংস্থাপিত ও নিয়মিত করিতে হইলে, তাহার সুশৃঙ্খলার নিমিত্তে কতকগুলি নিয়ম বা শাসন প্রস্তুত করিতে হয়। তাহা না করিলে, সে সমাজের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না, এবং অভীষ্টসিদ্ধি না হইয়া, বরং ক্রমে ক্রমে অনিষ্ট হইয়া উঠে। একটী সামান্য সমাজ সংস্থাপিত ও নিয়মিত করিবার নিমিত্ত যখন এরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিতে হয়, তখন বহুদূরবিস্তৃত মনুষ্যসমাজ সংস্থাপিত ও নিয়মিত করা মনুষ্যের সহজসাধ্য নহে। কিন্তু এই সমাজ-সংস্থাপনের নিমিত্তে মনুষ্যকে তাদৃশ পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় না। মনুষ্যের স্বাভাবিক যত্নেই ইহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সামাজিকেরা একত্র হইয়া, সদসদ্বিবেচনা করিয়া, যাহা নির্দ্ধারিত করেন তাহাই এ সমাজের নিয়ম হইয়া, সকলের মনে ক্রমে ক্রমে বদ্ধমূল হইতে থাকে।

জাতিভেদে সমাজভেদ হইয়া থাকে। এক্ষণে পৃথিবীতে মনুষ্যসমাজের মধ্যে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন অবান্তর সমাজ প্রচলিত আছে। কারণ বশতঃ সকল সমাজের অবস্থা সমান নহে। দেশীয়দের অজ্ঞানতা ও পরাধীনতা প্রযুক্ত হউক, আর অদূরদর্শী রাজাপুরুষগণের অবিচার আচার বশতঃই হউক, সমাজের উন্নতি সর্ব্বদাই রথচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে।

---

ধর্ম্ম ভিন্ন সমাজ ঠিক থাকিতে পারে

না, ধর্ম্মভিত্তির উপর সমাজ সংস্থাপিত হইলে সে সমাজ ও ধর্ম্মের লোপ কদাচ সম্ভব নহে। হিন্দু সমাজ ধর্ম্মের উপর সংস্থাপিত বলিয়া ইহার ভিতর দিয়া কত অত্যাচার ও অবিচারের প্রবল বন্যা প্রতি-বাহিত হইয়াগিয়াছে, তথাপি ইহা ভাসিয়া যায় নাই-ধর্ম্মবলে ইহা আর্য্যগণের কীর্ত্তি ধ্বজা স্বরূপ এখনও মস্তক উত্তোলন করিযা আছে। মোগল রাজত্বকালে অনেক ধর্ম্মের পরি-লোপ হইয়া ছিল কিন্তু হিন্দুর সমাজ ও ধর্ম্ম লোপ পায় নাই; ইতিহাস তাহার জাজ্বল্য মান প্রমাণ—Hinduism was for a time submurged but never drowned by the tide of the mohamadan conquest.

ধর্ম্মের দ্বারা ভিত্তি সুদৃঢ় বলিয়াই কোন সময় ইহা লোপ হইয়া যায় নাই। বস্তুত সমাজ তথা হিন্দু সমাজ যে অন্যান্য জীবজন্তু গণের সমাজ অপেক্ষা বিভিন্ন ও শ্রেষ্ঠ তাহার একমাত্র কারণ ধর্ম্ম ধর্ম্ম আছে বলি-য়াই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হইয়াছে। নতুবা পশুতে আর মনুষ্যে প্রভেদ কি? তাহাও পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন;—

“আহার-নিদ্রাভয়-মৈথুনঞ্চ
সামান্য মেতৎ-পশুভির্ণরাণাম।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ” ॥

ধর্ম্মের আশ্রয় সমাজ, সমাজের আশ্রয় ধর্ম্ম, সমাজই ধর্ম্মশিক্ষার প্রধান স্থান, শিক্ষা নবীশের শিক্ষার সোপান অতএব আমরা ধর্ম্ম ও সমাজ বজায় রাখিতে না পারিলে কখনই পুনরায় উন্নতির প্রশস্থপথে উন্নীত হইতে পারিব না। আঃসং।

---

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—আমাদের উপাদেয় উপহার পুস্তক ৪ খানি প্রস্তুত হইয়াছে, আমরা সকলের নামে এইবার হইতে ভিঃ পি করিব, যাহাদের আপত্তি থাকে, সত্বর জানাইবেন। নতুবা ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া আমাদের ক্ষতিগ্রস্থ করিবেন না ইহাই প্রার্থনা।

ম্যানেজার।

---

*Printed & published by* H. L. Dass
*at the* Karmayoga Printing Works
*208-210 Khooroot Road*
*Howrah.*

# অদর্শনে।

[ ১ ]

দেখিতে দেখিতে হায়, দিন যে চলিয়া গেল,
প্রাণের সোহাগ হাসি, ক্রমশঃ নিবিয়া এল।
নিবে গেল শশী তারা, আঁধার করিয়া নিশি,
কবে হবে দুজনার প্রাণ খুলে মেশামিশি?
গিয়াছে বসন্ত প্রিয়, প্রখর নিদাঘ জ্বালা,
গিয়াছে বরষা ঘন, চঞ্চল-চপলা বালা।
শরতের শুভ্রাকাশে হাসিয়া গিয়াছে বিধু,
ঢালিয়া সোনার বিশ্বে শিশির মুকুতা মৃদু;
প্রকৃতি পাতিয়া শয্যা, পবিত্র সেফালি তলে,
যাপিয়া গিয়াছে নিশি সিক্ত করি আঁখি জলে।
গাথিয়া নিকুঞ্জ—বালা ফুল্ল মালতীর হার,
দাঁড়ায়ে রয়েছে পথে, কারে দিবে উপহার?

[ ২ ]

বিহগ বিহগী যত নীরবে রয়েছে সবে,
গাহেনা পুলকে তারা তেমনি মধুর রবে!
তটিনী ভুলিয়া গেছে, মধুর কল্লোল তান,
প্রকৃতি-পরাণ-হাসি, হয়ে গেছে অবসান।
ঝরিয়া গিয়াছে কুঞ্জে, অস্ফুট কুসুমকলি
নাহি সে সুরভি সুধা, গুঞ্জরি আসেনা অলি,
সরলা ব্রততী বালা, শুকায়ে গিয়াছে হায়,
তোমার দরিদ্র কবি, কার পানে আজি চায়?

অতীত হ'য়েছে স্বপ্ন, স্বপনে পূর্ণিত হৃদি,
এ তীব্র যন্ত্রণা আর কত দিন দিবে বিধি।
নিদ্রাহারা নিশীথিনী, নিরাশা আকুল প্রাণে,
আর কত দিন রব চেয়ে তব পথ পানে?

[ ৩ ]

অতীতের সেই স্মৃতি—নির্জ্জনের বিনিময়,—
তোমার বিহনে আজি কেমনে পরাণে সয়?
সেই প্রেম, সেই প্রীতি,—অপার্থিব ভালবাসা,—
সেই সোহাগের হাসি, পিপাসা-মণ্ডিত-আশা,—
কভু প্রেমাবেশে মরি নীরবতা উপভোগ,
কভু বা অবশ দেহ, অধরে অধর যোগ;—
কভু অপলক দৃষ্টি, কভু প্রেম অশ্রুধারা,
কভু মৃদু পরশন, দুজনে আপনা হারা!
কোথা আজি সে সম্ভোগ--স্বর্গীয় অমৃত রাশি,
কোথা সে চুম্বন সুধা, অধরে মধুর হাসি?
স্মৃতির অদম্য ব্যথা, পূরিয়া এ শূন্য বুকে,
কবে রে জুড়াব জ্বালা, দুজনায় মুখে মুখে?

[ ৪ ]

কতদিন কাঁদিবরে এমনি বিরলে বসি,
কত ব্যথা দিবে আর মরমে বিরহ পশি'?
কবে পূর্ণ হবে এই হৃদয়ের শূন্য স্থান,
কবে রে গাহিবে হৃদি, প্রেমের পবিত্র গান?
ভাল বেসে প্রাণে প্রাণে, যাতনা দিয়োনা আর,
প্রণয়-সাগরে প্রিয়ে, তুলিওনা হাহাকার!
জানিনা রমণী-ধর্ম্ম, বুঝিনা রমণী-প্রেম,—
চিনিনা রজত, মণি, মুকুতা, রতন, হেম!
জানি শুধু তুমি স্বর্গ, তুমি অশ্রু, তুমি হাসি,
জানিনা তোমারে দেবি, কতখানি ভালবাসি।
তাই বলি প্রাণাধিকে, তোমার "স্নেহের কবি,"
হয় না বঞ্চিত যেন হেরিতে ও মুখ ছবি!

শ্রীঅটল বিহারি দাস

# দেশের প্রতি ভালবাসা।

দেশের প্রতি ভালবাসা অর্থাৎ স্বদেশানুরাগ সমাজের শ্রীবৃদ্ধির প্রধান কারণ। কি অশেষ শাস্ত্রপাঠী মনীষাসম্পন্ন পণ্ডিতগণ কি বর্ণজ্ঞান রহিত নির্বুদ্ধি পবিশ্রমোপজীবিগণ, সকলেরই মনে এই স্বদেশানুরাগ জাজ্বল্যমান আছে। কি ভদ্র, কি অভদ্র স্বদেশের বা স্বজাতির নিন্দা শুনিলে আগুন হইয়া উঠেন, প্রশংসা শুনিলে অতিশয় প্রীত হন।

স্বদেশের অনুরাগ অন্যান্য বিষয়ের অনুরাগের মত দর্শন সাধ্য বা শ্রবণসাধ্য নহে। যে বিষয় দেখিবামাত্র মনের তৃষ্ণা নিবৃত্তি ও চক্ষুর তৃপ্তি জন্মে, তাহাতেই সকল মানুষের অনুরাগ হয; কিন্তু স্বদেশের সেরূপ নহে। অপরাপর বিষয় যাহাতে লোকের অনুরাগ জন্মে, তাহার অবশ্য কোন প্রীতিকর ধর্ম্ম থাকে। স্বদেশানুরাগের পক্ষে সে নিয়ম দেখা যায না। স্বদেশ অসভ্যতায পরিপূর্ণই হউক, আর জঘন্য আচার ব্যবহারে ম্লান হইয়া থাকুক, তথাপি জন্মভূমি বলিযা তাহার প্রতি স্বদেশবাসীর একটী অনির্ব্বচনীয় অনুরাগ থাকে। এই স্বদেশানুরাগের বশবর্ত্তী হইয়াই সকল জাতিরা শত্রু হইতে দেশ রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া থাকে। নিজ পরিবারের কার্য্য হইতেও শ্রেষ্ঠতর ভাবিয়া স্বদেশ রক্ষায় একান্ত যত্নশীল হয়। ফলতঃ স্বদেশ ও স্বজাতি আপনার আবাস ও পরিবারের অনুরূপ মাত্র।

নিজ আবাসে যেমন আমরা অল্প পরিবার লইয়া থাকি, স্বদেশ গৃহে তেমনি স্বজাতীয় ভ্রাতৃভগিনী বহুপরিবার লইয়া বাস করিতেছি, মনে করা উচিত। পরিবারের মঙ্গলকার্য্যসাধন যেমন আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য, স্বদেশের মঙ্গলকার্য্যসাধনও আমাদের সেইরূপ অবশ্য কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। প্রতিদিন সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্তে আমাদিগকে যেমন ক্ষণকাল ভাবনা চিন্তা করিতে হয়, স্বদেশের মঙ্গলসাধনের নিমিত্তেও আমাদিগের ভাবনা চিন্তা করা অগ্রে কর্ত্তব্য। দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইলেই পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি হয।

স্বদেশানুরাগ যথার্থ ও ন্যায়ানুগত হওয়া আবশ্যক। দেশের যিনি সর্ব্বময় কর্তা সেই রাজাকে সন্তুষ্ট রাখিয়া দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিলে যথার্থ স্বদেশহিতৈষণাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারা যায়। কিন্তু আপামর সাধারণের যে স্বদেশানুরাগ আছে, সেটী স্বভাবসিদ্ধ, যাহা কিছু আপনার তাহারই প্রতি মমতাবশতঃ মানুষের অনুরাগ জন্মে; কিন্তু তাদৃশ অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া চলিলে দেশের উন্নতি না হইয়া, বরং ক্রমে ক্রমে অবনতি হইবারই সম্ভাবনা। স্বদেশের কুরীতি কুপ্রথা দেখিয়াও তাহার মিথ্যা প্রশংসা ও গৌরব করিয়া বেড়ান, ও সেই সমস্ত রীতি ও প্রথার সংস্কারের চেষ্টা না করা কাপুরুষের কর্ম্ম। সকল জাতিরই কোন না কোন দোষ আছে। কোন সমাজই একবারে বিশুদ্ধ হইতে পারে

না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেই সকল দোষ সংশোধন করা দেশীয়দের কর্ত্তব্য। স্বদেশের অভাবঅপ্রতুল মোচন ও কুপ্রথা প্রভৃতির সংস্কারসাধনই প্রকৃত স্বদেশানুরাগের ধর্ম্ম। কতকগুলি লোক স্বদেশ ও স্বজাতীর প্রতি অন্ধ অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া,দেশের আচারগত দোষ বা আপনাদের কুসংস্কারজনিত দোষ, কিছুই বুঝিতে পারে না। ওদিকে বিদেশের লোকদিগকে দুইচক্ষে দেখিতে পারেন না। বিদেশীর উন্নতিকে উন্নতি বলিয়াই বোধ করেন না। বিদেশীর নাম করিলেই অমনি একবারে জ্বলিয়া যান। এরূপ স্বদেশানুরাগকে যথার্থ স্বদেশানুরাগ বলে না। অতএব এরূপ অনুচিত স্বদেশানুরাগের বশীভূত হইয়া, স্বদেশের সর্ব্বনাশ করা স্বদেশবাসীর কর্ত্তব্য নহে। যাহাতে স্বদেশের হিতসাধন ও উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে আন্তরিক যত্ন করা অতি কর্ত্তব্য।

সর্ব্বপ্রযত্নে স্বদেশের মঙ্গলসাধন করা উচিত বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া, অন্যদেশের প্রতি অত্যাচার করিয়া স্বদেশের হিতসাধন করা উচিত নহে। ইহা অত্যন্ত স্বভাববিরুদ্ধ কর্ম্ম। স্বদেশের সুখসচ্ছন্দ বৃদ্ধি হইবে বলিয়া, আর এক দেশকে চিরকাল অধীনতা দুঃখে দুঃখিত করা নিতান্ত স্বার্থপর নিন্দনীয় কর্ম্ম। অন্যকে দুঃখ দিয়া আপনার সুখের চেষ্টা করা, যেমন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি অসভ্যের কর্ম্ম, অন্যদেশের অনিষ্ট করিয়া, স্বদেশের উন্নতি করা, তদপেক্ষা শতগুণে অসভ্যের কর্ম্ম সন্দেহ নাই। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর পৃথিবীর সকল দেশকেই মনুষ্যের বাসোপযোগী করিয়াছেন। পরিশ্রম করিলে. সকল দেশেই প্রাণধারণের নিমিত্ত পর্য্যাপ্ত আহার পাওয়া যায়। তাঁহার অনুগ্রহে সকল দেশে বসিয়াই শাস্ত্রের আলোচনা হয়। সকল দেশেই আমাদের সকল বাসনা পূর্ণ হইতে পারে। অতএব, অনুচিত স্বদেশানুরাগের বশীভূত হইয়া, অমঙ্গলের কারণ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করা, ও যুদ্ধ করিয়া অন্য দেশকে বশীভূত করা, কোন জাতিরই উচিত নহে। এরূপ করিলে, পরমেশ্বরের নিকট তাহার নিয়ম লঙ্ঘন জন্য অপরাধী হইতে হয়।

স্বদেশের প্রতি স্নেহমমতা অতি অনির্ব্বচনীয়। স্বদেশের মত মনের আহ্লাদকর ও চক্ষুর প্রিয়দর্শন পদার্থ, এমন আর কিছুই নাই। স্বদেশ যে কি রমণীয় পদার্থ, তাহা চিরপ্রবাসী ব্যক্তি বই আর কেহই বুঝিতে পারেন না। যখন তাঁহার হৃদয়মুকুরে স্বদেশের স্নেহময়ী মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হয়, তখন তিনি অস্থির হইয়া উঠেন। আহা! যেস্থলে বাল্যকালে মনের সাধে বাল্যখেলায় নিযুক্ত ছিলাম, যে স্থানে পরমসুখে যৌবনকাল যাপন করিয়াছি, যে স্থান স্নেহপূর্ণ পিতামাতা ভ্রাতাভগ্নি,পুত্র কলত্র বন্ধুবান্ধবগণের আবাস স্থান, তাহার নাম করিলে অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত পুলকিত হইয়া উঠে; তাহা অপেক্ষা প্রিয়তম পরম রমণীয় পদার্থ পৃথিবীতে আর কি আছে? এমন সুখময় স্বদেশের দুরবস্থা দেখিয়া যাঁহার মন চঞ্চল না হয়, তাঁহার গম্ভীরতাগুণে কি প্রয়োজন? স্বদেশের দুরবস্থা দেখিয়া যিনি নিশ্চিন্ত থাকেন, স্বদেশের দুরবস্থা দেখিয়া যাহার চিত্ত বিচ-

লিত না, হয় তিনি কখনই মনুষ্য নামের যোগ্য নহেন। আজ কয়েক বৎসর হইল আমরা দেশের প্রতি ভালবাসা দেখাইতে শিখিয়াছি কিন্তু যে ভাবে ভালবাসা দেখান হইতেছে, তাহাতে দেশের উন্নতি হইবে না ববং দিনদিন অবনতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। পাহাড়ে মাথা ঠুকিতে যাইলে নিজের মস্তকই বিদীর্ণ হইবে, পাহাডের কিছুই হইবে না। তবে অনর্থক মস্তক বিদীর্ণ করিয়া ফল কি? ইংবাজ আমাদের দেশের রাজা; অধুনা তাঁহাদের প্রজা পালন বিষযে অনেক ঔদাস্য দেখিতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু তথাপি তাঁহাদের অপ্রীতিকর কার্য্যে প্রজার উত্তেজিত হওয়া উচিত নহে। কোনও বস্তুই জগতে চিরস্থায়ী নহে। রাজা মন্দ কর্ম্ম করেন তাহার ফলভোগ এই বিশ্ব রাজ্যের এক মাত্র অধীশ্বর ভগবানের নিকট হইবে; তাই বলিযা আমরা কেন অধর্ম্ম কবিযা পতিত হইব? যে কার্য্যে নিজের আয়ত্তাধীন; যে কার্য্য করিলে সহজে কোন বাধা বিপত্তির সম্ভাবনা নাই; আসুন আমরা সেই রূপ স্বদেশী কার্য্যে ব্রতী হই; স্বদেশেব শিল্প বাণিজ্যে উন্নতি সাধন করিয়া প্রকৃত দেশের এবং দশেব প্রতি ভালবাসা দেখাইতে চেষ্টা করি। আঃ মং

---

# দম্পতীর পত্রালাপ সমালোচনা।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ).

নবেন্দ্র নাথ প্রাণ ভযে নৃত্য গীত বন্ধ করতঃ সেই ভযঙ্কর প্রকৃতির প্রলযকারী অবস্থাব মধ্যে নিপতিত হইলেন। গ্রন্থ-কারের দৌলতখাঁর শোচনীয় বর্ণনা বড়ই হৃদয়-স্পর্শী, যেমন ভাষার ওজস্বিনীতা, তেমনই দৃশ্য ভাবের সমাবেশ। দৌলতখাঁব এই বর্ণনা পাঠ করিলে, গ্রন্থকারের বর্ণনা শক্তির পাণ্ডিত্যেব জন্য অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতে ইচ্ছা হয়।

দৌলতখাঁর সেইজল প্লাবনে আশ্রয় হীন হইয়া সকলে ভাসিতে লাগিল। পিতা পুত্র, জননী, ভার্য্যা, তনয়, তনয়া সকলে জীবনভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া অনন্তস্রোতে ভাসিযা চলিল। ঘর দরজা, বৃক্ষ জল-স্রোতে ভাসমান, যে যে বস্তু পাইল, তাহাব সাহায্য গ্রহণ করিল, যে কিছু আশ্রয় না পাইল, কবাল প্রকৃতির ভীষণ প্লাবনে ডুবিযা গেল। এইরূপে পতি পত্নীচ্যুত হইল। মাতা পুত্র চ্যুত হইল। শিশু আশ্রয় চ্যুত হইযা বাবা বলিয়া পিতার সম্মুখে জলতরঙ্গে ভাসিয়া চলিল, পিতা নিরুপায় হইয়া সম্মুখে সলিল মধ্যে সন্তানেব সমাধি নিরীক্ষণ করিলেন।

নরেন্দ্রনাথ অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া একখানি চালের উপরে ভাসিতে ভাসিতে আসিতেছিলেন। তরঙ্গাঘাতে তাহাব শরীর অবসন্ন ও কণ্টকাঘাতে তাহার

শরীর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। অন্তিম সময় আসন্ন প্রায় মনে করিয়া নরেন্দ্রনাথ উচ্চৈস্বরে ডাকিতে লাগিলেন :—

'কোথায় তুমি চঞ্চলে—প্রাণাধিকে সাধ্বী সহধর্ম্মিনী আমার—কোথায় তুমি। একবার আমার অন্তিমের এই দৃশ্য অবলোকন কর। আমার পাপের পরিণাম প্রত্যক্ষ কর। আমি তোমার নিকট অনন্ত অপরাধে অপরাধি। তোমার নিকট ক্ষমা পাইবার অযোগ্য। তবু তুমি পতিপ্রাণা সাধ্বী—তাই তোমার নিকট আজ ক্ষমা চাহিতেছি। তুমি কোথায় আজ জানি না, যেখানেই থাক, আমার এ অন্তিমের প্রার্থনা তোমার নিকট পঁহুছিবার প্রার্থনা করি। কিন্তু কে আমার এ প্রার্থনা পূরণ করিবে। এমন কেহ আছে কি"? প্রবল বেগে একটী তরঙ্গ আসিয়া নরেন্দ্রনাথের শরীরোপরি পতিত হইল।

'মানিনাই—এতদিন প্রভো তোমাকে মানি নাই। ধন মদে, সুখবিলাসে বিমুগ্ধ হইয়া তোমাকে বিশ্বাস করি নাই। তোমার করুণাময় মূর্ত্তি দেখিয়া জড়বৎ অবহেলা করিয়াছি।

আজ তোমার সংহার মূর্ত্তি দেখিয়া তোমাকে চৈতন্যময় প্রত্যক্ষ করিতেছি। তুমি অসীম দয়ার সাগর। আমায় ক্ষমা কর প্রভো—আমার প্রতি একটু দয়া কর।' দয়া করিয়া আমাকে আর কিছুকাল বাঁচাইয়া রাখ"।

কিছুকালের জন্য আমায় বাঁচাইয়া রাখিলে আমি সাধ মিটাইয়া চঞ্চলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মরিতে পারি।

যে নরেন্দ্রনাথ ধনমদে প্রমত্ত হইয়া চঞ্চলাকে গৃহ বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন। যে নরেন্দ্রনাথ ভগবানের প্রতি দোষারোপ করিয়া অবিহিত উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া বিলাস তরঙ্গে ভাসিতেছিলেন, সেই নরেন্দ্রনাথই আজ ঘটনা চক্রে আসন্ন সময় সব অপরাধ স্বীকার করিলেন।

এখন প্রশ্ন এই যে, গ্রন্থকার চঞ্চলা দ্বারা স্বামীর উদ্ধার করাইয়া আবার নরেন্দ্রনাথের সম্মুখে এই আসন্ন বিপদের সৃষ্টি করিলেন কেন? ইহার উত্তর সহজ। নরেন্দ্রনাথ যদি আজ এই বিপদে নিপতিত না হইতেন তাহা হইলে তার নিজকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইত না।

প্রথমতঃ তিনি কখনই নিজ অপরাধ সকলের সম্মুখে স্বীকার করিতেন না। পাণ্ডিত্যবলে নীতিকে পদদলিত করিয়া পাপকার্য্যকে পুণ্য কার্য্য মনে করিতে অভ্যস্ত হইবেন।

দ্বিতীয়তঃ একরূপ জীবন নাশক বিপদে না পড়িলে, তাঁহার হৃদয় অগ্নিদগ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করিত না। চঞ্চলার যাহা কর্ত্তব্য তাহা গ্রন্থকার পূর্ব্বেই চঞ্চলা দ্বারা সীমাবদ্ধ করাইয়া চঞ্চলার যে প্রার্থনা—স্বামীর দেবচরিত্র দর্শন পূর্ণ করাইলেন। বিপদই লোককে চৈতন্য দান করে ও উচ্চ শিক্ষার পথ পরিষ্কার করিয়া তাহাকে অসীমত্বের দিকে লইয়া যায়।

চঞ্চলা গ্রন্থকারের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি ইহাঁকে বুঝিতে হইলে যোগ তত্ত্ব বুঝিতে হয়।

চঞ্চলার জীবনের প্রধান উপাদান যোগ। আমরা ঈশ্বর আরাধনার ফলে চঞ্চলার ভৈরবী দর্শন ও তৎসহবাসে ভগবানে তাহার একাগ্রতা উপলব্ধি করিয়াছি। চঞ্চলার স্বপ্নবৃত্তান্ত সফল হইতে দেখিয়াছি। চঞ্চলা তাহার পতির যেরূপ ভাগ্য নির্ণয় করিয়াছিলেন, আমরা পরিণামে তাহাই ঘটিতে দেখিয়াছি। একজন রমণীর পক্ষে ভগবৎ-রাজ্যে প্রবেশের উপায় স্থির করিয়া আশা-পূর্ণ হৃদয়ে অগ্রসর হইতে দেখিয়া পরম শ্রদ্ধা-পরবশ হইয়াছি। কিন্তু যে ঘটনা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, তদপেক্ষা সহস্রগুণ বিস্ময়-কর ঘটনা এই দৌলত খাঁর জলপ্লাবনে প্রত্যক্ষ করিলাম।

সেই কালরাত্রি, যে রাত্রে দৌলতখার সর্ব্বনাশ ঘটে, সেই রাত্রে মহাপুরুষ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ভৈরবী চঞ্চলাসহ এক উচ্চ বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। চঞ্চলা সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া প্রথমতঃ প্রায় চৈতন্য শূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, পরে, প্রকৃতির দুর্জ্জেয় রহস্য দেখিয়া ভয়শূন্য হইলেন। ভয়ের পরিবর্ত্তে ভক্তি আসিয়া চঞ্চলার ধর্ম্মপূর্ণ হৃদয়-খানি অধিকার করিল। চঞ্চলা দেখিলেন ভগবান দয়া করিয়া স্বপ্নের মধ্যে তাহাকে সম্পূর্ণ দেখাইয়াছেন, তাহাই দৌলতখাঁয় অভিনীত হইতেছে। চঞ্চলা সেই সর্ব্বগ্রাসী করালমূর্ত্তির মধ্যে তাহার উপাস্যকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। জড়প্রকৃতির দৌরাত্ম্য তাহার হৃদয়ে স্থান পাইল না। স্বপ্নময়ী-মূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে তন্ময় হইয়া পড়িলেন।

চঞ্চলা যখন তন্ময়, তখন এক সাপটা বাতাস আসিয়া তাহার ক্রোড়স্থ শিশুকে ক্রোড়চ্যুত করিল।

গ্রন্থকার এই সময়ের ভাব বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন, "চঞ্চলা তবু নড়িলেন না—একটু শব্দ ও করিলেন না। এক বিন্দু অশ্রু মোচন করিলেন না। ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে সেই মহামহিমাময়ী মূর্ত্তি ভাবনা করিতে লাগিলেন। তাহার সকল দুঃখ সকল কষ্ট তিরোহিত হইল। চঞ্চলা তখন আনন্দ প্রপূরিত হৃদয়ে মায়ের সেই সংহার মূর্ত্তির মধ্যেই অপূর্ব্ব প্রশান্ত ও কামনাপূর্ণভাব অবলোকন করিতে লাগিলেন। গ্রন্থকার এই সংহার মূর্ত্তির মধ্যে জগজ্জন রঞ্জনকারিণী কমনীয় মূর্ত্তির সমাবেশ করিয়া যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, ও চঞ্চলার হৃদয় হইতে সেই মূর্ত্তি দর্শনের যে সুন্দর ভাব ফুটাইয়াছেন, তাহা বুঝিতে হইলে ঈশ্বরের প্রেমরসে নিমজ্জিত হইতে হয়; নতুবা চঞ্চলার সেই ঈশ্বর প্রেমস্ফুরিত মহান চরিত্রের মহান ভাব প্রকাশ করা যায় না। তবে এই মাত্র বলি যে, যে মূর্ত্তি দেখিয়া দৌলতখার সকলে জীবন ভয়ে রণক্ষেত্রে পতিত আহত লোক যে আর্ত্তনাদ করে, তদপেক্ষা গভীর আর্ত্ত-নাদ করিয়া চতুর্দ্দিক নিনাদিত করিতেছিল। যে করাল মূর্ত্তিতে ভীত হইয়া নরেন্দ্রনাথ গগন বিদারী চীৎকার করিতেছিল, সেই মূর্ত্তি দেখিয়া চঞ্চলা স্থির, অবিকম্পিত তন্ময়। চঞ্চলা সেই মূর্ত্তির মধ্যে এমনই কোনও সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়াছিলেন যে, যাহার উপভোগে পুত্র শোক, পতির স্মৃতি,

দারিদ্র দুঃখ সব ভুলিয়া যাওয়া যায়। চঞ্চলা সাধিকা, আমি ক্ষুদ্র নরাধম, চঞ্চলার সেই অবস্থার মনের উচ্চভাব আমি কি কথা দ্বারা প্রকাশ করিব। তবে, বুঝা যায় যে, এ সংসারে যত কিছু সুখ দুঃখের কারণ থাকুক না কেন, সেই মূর্ত্তি সৌভাগ্যক্রমে দর্শন করিতে পারিলে, পার্থিব অন্য সকল জিনিষই তাহার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর বোধ করা যায়।

গ্রন্থকার, নরেন্দ্রনাথ ও চঞ্চলাকে একই-রূপ ভীষণ অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া কি দেখাইলেন, নরেন্দ্রনাথ সেই বিপদে পতিত হইয়া প্রতিমুহূর্ত্তেই জীবননাশের আশঙ্কার সঙ্গে সমস্ত পাপপূর্ণ ঘটনা স্মরণ করিয়া মৃত্যু তুল্য যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিলেন, আর চঞ্চলা সেই বিপদই সম্মুখে রাখিয়া তাহার মধ্য হইতে ভগবানের বিভূতি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইতে ছিলেন। ইহা দ্বারা আমরা এই নীতি শিখিলাম।

(ঙ) ঈশ্বর পরায়ণ লোকের নিকট কোনও অবস্থায় নিষ্পেষণই চিত্তের অপ্রফুল্লকর চিত্ত জ্ঞান নাশক নহে। উহারা যে অবস্থায় দাঁড়াইয়া সুখী হয়েন, পাপী সে অবস্থায় পড়িলে সঙ্কিত হয়।

এই সাধিকা চঞ্চলার স্বামীমিলনও গ্রন্থকার এক অলৌকিক ব্যাপার দ্বারা ঘটাইছেন, নরেন্দ্রনাথ সেই জলপ্লাবনে এক খানি চালের উপর ভাসিতে ভাসিতে আসিতেছিলেন, চঞ্চলা যে বৃক্ষোপরি যোগমগ্না ছিলেন, সেই বৃক্ষটি ঝঞ্ঝাবাতে প্রবাহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই চালের উপর চঞ্চলা সহ পতিত হইল। ভগবানই যেন ধর্ম্মের পুরস্কার স্বরূপ বিনা আয়াসে চঞ্চলার নিকট স্বামীকে আনাইয়া চঞ্চলাকে পুরস্কৃত করিলেন। যেরূপ বিভিন্ন দেশস্থিত পৃথক দুইটি নদীর স্রোতরাশি মহান সমুদ্রের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়া দেশ দেশান্তর ঘুরিয়া ফিরিয়া উহার মধ্যস্থান প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ বিভিন্ন পথ ভ্রমণকারী নরেন্দ্রনাথ ও তাহার ভার্য্যা চঞ্চলা ঘটনাচক্রে ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সংসার সাগরে আসিয়া মিলিত হইলেন। কে বলে মিলন অসুখের? মিলিতে জানিলে হয়!! মিলন বহু শিক্ষা সাপেক্ষ। বহু গুণ লাভের পরিণাম!

সহঃ সম্পাদক।

# হিন্দুর শাস্ত্র শিক্ষা।

পুরাকালের আর্য্য ঋষিগণের প্রতি পালিত হিন্দু ধর্ম্ম মানিতে হইলে, তাহার পবিত্রালোকে হৃদয় আলোকিত করিতে হইলে, শাস্ত্র শিক্ষা ভিন্ন, হিন্দুর বেদান্ত দর্শনরূপ কল্পবৃক্ষের আশ্রয় ভিন্ন, গূঢ় মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। আমাদের শাস্ত্র-অধ্যয়ন করিতে হইলে, প্রথমতঃ সংস্কৃত শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। সংস্কৃত না জানিলে হিন্দুশাস্ত্র আয়ত্ত করা যায় না। হিন্দুশাস্ত্রের চর্চ্চা করিতে হইলে সংস্কৃত শিক্ষা ও তৎসহ সদ্‌গুরুর উপদেশ ও তেমনি—আবশ্যক, গুরু ভিন্ন এই গুরুতর শিক্ষার, এই অতলস্পর্শ সাগরসম হিন্দু শাস্ত্রের মর্ম্মোদ্ঘাটন করা একেবারেই অসম্ভব, অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্র সংকীর্ণ নহে, বেদের কথা ছাড়িয়া দিউন, প্রথম শিক্ষার সোপানস্বরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ গুলিও পড়িয়া শেষ করা যায় না, তাহার সংখ্যাও অসংখ্য; অপর ধর্ম্মে যেমন এক একখানি শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করিলেই ধর্ম্মের সমস্ত বিষয় উপলব্ধি করিতে পারা যায়, ইহা তাহা নহে, ইহার অগণ্য গ্রন্থ, ইহা এক জন্মেও শেষ করিবার নহে; এই জন্য হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইলে, সদ্‌গুরুর সেবা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিলে হিন্দুর ধর্ম্মের মাহাত্ম্য এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইহার পরম পবিত্র ভাব হৃদয়ফলকে অঙ্কিত করিতে পারা যায়। কিন্তু এই বর্ত্তমান কলিযুগে সদ্‌-গুরুর নিতান্তই অভাব হইয়া পড়িয়াছে, এক প্রকার পাওয়া যায় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; ভণ্ডের ভণ্ডামীতে, জুয়া চোরের জুয়াচুরিতে হিন্দুধর্ম্ম আজ কাল মলিনত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, ক্রমশঃ ইহার প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা দৃঢ়ীভূত হইতেছে।

হিন্দু ধর্ম্ম বুঝিতে হইলে যখন শাস্ত্রের সহায়তা ভিন্ন কোন প্রকারে তাহা বুঝিবার উপায় নাই; তখন নিজে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া ইহার পবিত্র শাস্ত্রসকল অধ্যয়ন কর; সদ্‌গুরুর সাহায্যে ইহার গুহ্য বিষয় সকল বুঝিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে জানিতে পারিবে যে হিন্দুধর্ম্ম কি পরম পদার্থ, ইহার ভিতর কি স্বর্গীয় ভাব নিহিত রহিয়াছে—তখন জানিতে পারিবে হিন্দুধর্ম্ম কি চমৎকার জিনিষ।

অবশ্য এখন উপযুক্ত সদ্‌গুরু মেলা ভার হইয়াছে। কারণ এখন আর হিন্দু রাজা নাই; হিন্দুধর্ম্ম যাজক, সাধুচেতা স্বার্থশূন্য, উদার-হৃদয় ব্রাহ্মণ বংশের প্রায় উচ্ছেদ হইতে বসিয়াছে। যখন ব্রাহ্মণের পরিপোষক ও রক্ষক রাজা নাই, যখন ধর্ম্মের রক্ষক শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণও নাই, তখন আর ইহার মর্য্যাদা, রক্ষা হইবে কিসে? আর কেইবা ইহার আদর করিবে, সকলেই পেটের জ্বালায় অস্থির। আর কি ধর্ম্মের রক্ষক রাজা পরিরক্ষিত আছেন, যে কলির গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে, ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত

হইবে? এক্ষণে রাজা আমাদের বিজাতীয়—ভিন্ন ধর্ম্মী, কালও ঘোর কলি, ধর্ম্ম ও ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া একপাদ পরিমিত হইয়াছে, জাল জুয়াচুরি, শঠতা, প্রবঞ্চনা, প্রভৃতি এক্ষণে কাল মাহাত্ম্য হইয়াছে। এই জন্যই ধর্ম্মের উপদেষ্টা সদগুরু পাওয়া দুর্লভ হইয়াছে। এখন নিজের চেষ্টা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই, এক্ষণে নিজে নিজে শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়া ধর্ম্ম ভাব উপলব্ধি করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়; এইরূপ ধর্ম্ম চর্চ্চা করিতে যেন কেহ বিস্মৃত না হয়।

বর্ত্তমান কালে কেবল শাস্ত্রকে গুরু করিয়া ধর্ম্ম তত্ত্ব শিক্ষা করাই উচিত। পবিত্র মনে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে বহু বৎসরের পর হৃদয়ে যে ভাব বদ্ধমূল হইবে তাহাই পরম পবিত্র চিরস্থায়ী ভাব, তাহাই তোমার প্রাণের সহিত সংবদ্ধ হইয়া তোমায় কর্ত্তব্যপথে পরিচালিত করিবে। শাস্ত্র ছাড়া ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝিবার আর অন্য উপায় নাই। এই রত্নাকর সদৃশ হিন্দু শাস্ত্রে যাহা নাই, তাহা আর কোথাও পাইবেন না; তাই বলিতেছি—ইহার সহিত অন্য ধর্ম্মের পার্থক্য অনেক।

আমাদের ধর্ম্মে পাপ ও পুণ্যের দ্বারা মুক্তি লাভ হয় না। শাস্ত্র পাঠ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ হইলে, ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করিয়া নিষ্কাম হইতে পারিলে, তবে মুক্তি পথের পথিক হইতে পারা যায়। পাপ ও পুণ্যে কেবল অবস্থার তারতম্য হয় মাত্র। যিনি জ্ঞান লাভ করিয়া ভগবানে আত্ম সমর্পণ করিতে পারিয়াছেন, ত্রিলোকে তাঁহার আর চিন্তার বিষয় কিছুই নাই, ভগবান তাঁহাকে রক্ষা করিবেন; কাহার সাধ্য তাঁহার অনিষ্টাচরণ করে। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদকে মারিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা কি তাহার সফল হইয়াছিল? বরং লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া নিজের জীবনকেও দুদশাগ্রস্থ করিয়াছিলেন। পঞ্চম বর্ষীয়, হরি-প্রেমে আত্মহারা ধ্রুবকে সেই হিংস্র জন্তু সমাকুল বিজন বনে কে রক্ষা করিয়াছিল।

শিশু মনে প্রাণে ঐক্য করিয়া ডাকিল,—

—পদ্ম-পলাশ-লোচন হরি তুমি কোথায়!

তখন কই ব্যাঘ্রাদিতে ত তাহাকে বিনষ্ট করিতে পারে নাই? কিন্তু অন্য শাস্ত্রের উপদেশ এরূপ নহে। খৃষ্টানদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রে আছে, যখন এডাম এবং ইভ ভগবানের দ্বারা রক্ষিত হইয়া, ইডেন্ উদ্যানে প্রেরিত হয়, তখন সয়তান আসিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্ম-পথ ভ্রষ্ট করিয়াছিল, তাহাদের অনিষ্ট করিয়াছিল। ভগবানের দ্বারা রক্ষিত যে ব্যক্তি, সয়তান তাহার অনিষ্ট করিল এবং তাহাতেই তাহাদের অধঃপতন হইল, এ কিরূপ উপদেশ? আমাদের শাস্ত্রের উপদেশ কিন্তু তাহা নহে, হিন্দু শাস্ত্রের উপদেশ-ধ্রুব প্রহ্লাদের চরিত্র পাঠ করিলেই বিশেষ রূপে অবগত হইতে পারা যায়। এই জন্য হিন্দু ধর্ম্মের সহিত অন্য ধর্ম্মের বিস্তর প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। তাই বলিতেছি ভণ্ড-লোকের দ্বারা প্রতারিত না হইয়া বরং ভক্তি ভাবে নিজে নিজে শাস্ত্র

আলোচনা, করিলে, তাহা অপেক্ষা বেশী ফল লাভ হইতে পারে। আজ কাল বড়ই বিষম সময় পড়িয়াছে, কে ভাল কে মন্দ, কে মেকী কে খাঁটিচিনিয়া লওয়া দায় হইযাছে।

তবে কি ভাল লোক একবারেই নাই, তাহা নহে। বিশেষ চেষ্টা করিয়া হিন্দুধর্ম্মের পবিত্র প্রাঙ্গন হইতে উপবৃক্ষ বা আগাছা সকল নষ্ট করিয়া প্রকৃত ফলবান বৃক্ষ বাছিযা লইতে পারিলে এখনও জিনিষ পাওয়া যায; কিন্তু এখন সেরূপ চেষ্টাই বা কাহার আছে, এখন উদরান্নের চিন্তা করিবে, না গুরুর অন্বেষণে ব্যস্ত থাকিবে? এই জন্য বলিতেছিলাম— নিজে নিজে যেটুকু অভ্যাস করিতে পারা যায়, সেই টুকুই ভাল, পবিত্র মনে শাস্ত্রের শাসনাধীন থাকিলে অবশ্য ফল লাভ হইবে। হিন্দু ধর্ম্মের তুল্য ধর্ম্ম আর নাই, সকল ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে পারা যায় কিন্তু অন্য ধর্ম্ম হইতে হিন্দু ধর্ম্মে প্রবেশ লাভ করা বড় কঠিন কারণহিন্দুধর্ম্ম বলে—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহ" হিন্দু ধর্ম্ম এক্ষণে অনেকের বিদ্বেষের বস্তু হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ইহার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? ইহার কখন উচ্ছেদ হয নাই, হইবেও না ইহার উপর দিয়া কত বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে, কত রাজার কঠোর তাড়নারূপ কত প্রবল ঝটিকা ইহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, তথাপি ইহার কিছুই নাই। হিন্দুধর্ম্মরূপ মহা অট্টালিকার সাজ সজ্জা সমস্তই গিয়াছে বটে, কিন্তু ইহার বনিয়াদ পাকা, অনন্ত কালের সাক্ষী স্বরূপ ইহা চিরকাল সমভাবে থাকিবে। কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রচারিত ধর্ম্ম হইলে, হিন্দুর আদি গ্রন্থ কোন ব্যক্তি দ্বারা প্রণীত হইলে এতদিন ইহার অস্তিত্ব কি বর্ত্তমান থাকিত? যাহার আদি নাই, অন্ত নাই তাহার আবার উচ্ছেদ কি? সুতরাং হিন্দু ধর্ম্মের কখনও অবসান হইবে না। হিন্দুজাতির অধঃপতন হইতে পারে, হিন্দু নাম জগত হইতে লোপ না হইলে এই সনাতন ধর্ম্ম ও হিন্দুশাস্ত্রের লোপ হওয়া কখনই সম্ভব নহে।

এই বীরভোগ্যা বসুন্ধরা কতবার কত লোকের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। কত বীর নিজ ভুজবলে ইহাকে অধিকার করিয়াছে এবং কাল মহাত্ম্যে পুনরায় এখান হইতে অপসৃত হইয়াছে। বীর গণের বিনাশ ঘটিলেও যে বসুন্ধরা সেই বসুন্ধরাই আছেন। সেইরূপ হিন্দু শক্তি—সামর্থ্য হীন হইলেও হিন্দু-ধর্ম্ম হীনবীর্য্য হইবে না। যিনি সাধক ধর্ম্মবীর হইবেন, তিনি অবলীলাক্রমে ইহার চরণ ছায়ায় সুশীতল হইয়া, নিজ মনপ্রাণ জুড়াইবেন, হৃদয়ে চিরশান্তি উপভোগ করিতে পারিবেন, এইরূপ সাধুপুরুষই আমাদের প্রণম্য, তাহার চরণ ধূলি আমরা মস্তকে ধরিতে পারি, ভাই শিক্ষিত হিন্দু! কেন বৃথা সময ক্ষেপন করিয়া আপনার পদে আপনি কুঠারাঘাত করিতেছ, বুঝিযা দেখ, যাহা তোমাদের আছে, তাহার তুলনা নাই, অতএব ভক্তি ভরে শাস্ত্র চর্চ্চা করিয়া নিজের ধর্ম্ম বজায় রাখিতে চেষ্টা কর। তোমাদের মঙ্গল হইবে।

সম্পাদক।

# অচিন্ত্য-রহস্য।

ছেলেবেলায় যবে তোমার সনে
প্রথম-দেখা আমার খেলা-ঘরে,
তখন কেবা ভাবিয়াছিল মনে
মিলন দোঁহে হইল চিরতরে।
ঊষার কোলে ঊষার মত হাসি'
আমার ঊষা! আমার ফুলরাশি।
আসিতে তুমি আমার ফুল বনে
গাঁথিতে মালা যতন কত করে!
"তখন কেবা ভাবিয়াছিল মনে
মিলন দোঁহে হইল চিরতরে॥

তা'পর যবে উঠিল মহা ঝড়
ভাঙিয়া সেই খেলার ঘর খানি
তখন কিবা ভাবিল চরাচর
বাঁধন দোঁহে অটুট হ'ল রাণি।
কোথায় তুমি ভাসিলে দূরদেশে,
হেথায় আমি পাগল হেন বেশে
স্মৃতি তোমার কেবল দৃঢ়তর
আকুল হয়ে হিয়ায় নিল টানি'।
তখন নাহি ভাবিল চরাচর,
বাঁধন দোঁহে অটুট হল রাণি।

কত বরষ, কত দিবস মাস,
ফুরায়ে গেল কখন ক্ষণে ক্ষণে,—
ভাবনা নাহি আসিল কারো পাশ
আপন মোরা হয়েছি মনে মনে!
দয়াল বিধি সবার অগোচরে
ললাট-লিপি লিখিলা নিজ করে,
মধুর বোলে পূরিল দেব বাস
বরণ করি লইল দুই জনে।
ভাবনা তবু এলনা কারো পাশ
আপন মোরা হয়েছি মনে মনে!

সন্ধ্যা ধীরে নামিয়া আসে আজ
আকাশ-বুকে লুটায় রবি-কর,—
কামনা জাগে দোঁহার হৃদি মাঝ
একই সাথে ফিরিয়ে যেতে ঘর!
মলিন ধরা মলিন দুটী আঁখি
ভাবিছে শুধু দোঁহার পরে রাখি—
"এদের কিবা নাহকো কোন কাজ,
হেথায় এরা নয়কো কিবা পর!—"
বুঝিবে কেবা, বুঝাব কারে আজ,
নই গো মোরা, নইগো দূরতর!!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

# আশা।

[ ১ ]

ধন্য তুমি কুহকিনি! আশা মায়াবিনি!
মানব হৃদয়ে পাতি হৈম সিংহাসন,
ভুলাইয়া কত ছলে, শান্তি প্রদায়িনী!
অধিকার করিয়াছ সবাকার মন।

[ ২ ]

নয়ন রঞ্জন সুবিশাল বসুমতি
মরুভূমি হ'ত, যদি তুমি না থাকিতে,
না জানি কি গুণে তুমি ধর এ শকতি,
আলোকে মানব মন প্রদীপ্ত করিতে?

[ ৩ ]
বিয়োগ-বিধুরা বধূ মলিন বসনা
অভিষিক্ত করে ধরা নয়ন-আসারে,
পুত্রহারা জননীর পুরাও কামনা,
ভুলাইয়া প্রলোভনে অশেষ প্রকারে।

[ ৪ ]
হতাশে উদাস প্রাণ দরিদ্র যে জন
নাহি যার এ সংসারে কোথা শান্তি স্থল,
রাখেনা বাসনা যেই বাঁথিতে জীবন
তোমার কুহকে সেও হৃদে পায় বল ॥

[ ৫ ]
মৃত্যু-শয্যা-শায়ী রোগী শয্যার উপরে
জীবন প্রদীপ যার নিবিবে এখনি,
পরিহরি এ সংসার যাবে স্বর্গপুরে,
মন্ত্র দাও কর্ণে তার "ভয় কি বাছনি ?"

[ ৬ ]
সসাগরা ধরণীর অধিপতি নর,
অভাব নাহিক যার কভু ধনে জনে,
সে জন হইতে চায় স্বর্গের ঈশ্বর,
প্রলোভিনী তুমি ? পড়ি তব প্রলোভনে—

[ ৭ ]
কিবা দীন অর্থহীন কিবা সে ভূপতি
জ্ঞানী কি অজ্ঞান পাপী তাপি যত জন,
সর্ব্বজীবে সমভাবে তোমার বসতি,
সাদরে সকলে তোমা করে আলিঙ্গন।

[ ৮ ]
মরীচিকা রূপী আশা ! নিরখি তোমারে,
বারিভ্রমে তৃষ্ণাতুর তোমা পানে ধায়,
না পাইয়া শেষ তব, হতাশ অন্তরে,
জীবন হারায় পড়ি মৃগ-তৃষ্ণীকায়।

[ ৯ ]
নাচাইতে নানা রঙ্গে মানবের মন,
কেহ নাহি এ জগতে তোমার সমান
বলে বটে লোকে তোমা, "শান্তি নিকেতন"
অশান্তি-আকর আমি করি অনুমান।

[ ১০ ]
পশু, পক্ষী, কীট, নর যে কেহ জগতে,
তোমার নিকটে কারো নাহিক নিস্তার,
না হলে সফল তুমি, তাহাদের চিতে,
কি ঘোর যাতনা হয়, অশান্তি সঞ্চার।

[ ১১ ]
দারা, সুত, পরিজন সবে হারাইয়া,
একাকী বসিয়া যেবা আঁধার ভবনে,
হেরি তব কমণীয় মুরতির ছায়া,
বাঁচিতে বাসনা তবু সেও করে মনে।

[ ১২ ]
জনক জননী বৃদ্ধ রয়েছে বসিয়া,
একে একে বহু পুত্র যমে দিয়া ডালি,
অবশেষে দুগ্ধ-পোষ্য সন্তান লভিয়া,
আশায় বাঁধিয়া বুক, পাতে গৃহস্থালী।

[ ১৩ ]
কুমারী সরলা বালা সেবি পঞ্চানন,
"ভাল পতি দিও মোরে" মনে মনে, বলে,
জানে না যে ভবিতব্য নিঠুর কেমন,
"বাসরে-বিধবা" তার লেখা আছে ভালে ॥

[ ১৪ ]
অশান্তি-নিলয় তুমি ? সফল না হ'লে,
চরাচর যেন তায় বিষম বিমুখ,
হেরি তব গতি তাই কবিগণ বলে,
আশাই পরম দুঃখ, নিরাশাই সুখ।

[ ১৫ ]

বিশ্বজয়ী তুমি আশা, জগতে বিদিত,
তোমার প্রভাবে মুগ্ধ আছে সর্ব্বজন,
কেবল তাহার কাছে আছ পরাজিত,
ভগবানে চিত্ত যেই করেছে অর্পণ।

[ ১৬ ]

ছাড়িয়া সংসার মায়া নিবিড় কাননে,
পর্ব্বত-কন্দরে বসি আনন্দ অন্তরে,
যাপে যেই সদাকাল বিভুগুণ গানে
সেই শুধু গেছে তব অধিকার পারে।

[ ১৭ ]

"আমি" কেহ নই মনে জানিয়াছে যেই,
বিভুর বিভূতি দেখে চরাচরময়,
রিপু ছয় করি জয় বসিয়াছে সেই
সেই শুধু করিয়াছে তোমাকেও জয়।

[ ১৮ ]

সুখ দুঃখ সমভাব অনুমিত যার
সমান যাহার কাছে স্বর্গ-মর্ত্ত্য ভূমি,
আপনার চিত্তে যার নাহি অধিকার
কেবল তাহার কাছে পরাজিত তুমি॥

শ্রীসুধীর চন্দ্র মুখোপাধ্যায়য়।

# Secrecy বা গোপন।

কাহারও কাহারও এমন তরল প্রকৃতি যে, একের কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করিয়া দিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না, বরং আনন্দ বোধ করিয়া থাকে। এরূপ অভ্যাস মহা অনর্থের আকর, অতএব বর্জ্জনীয়।

আমরা যখনই অপরের নিকট হইতে কোন বিষয় শ্রবণ করিয়া থাকি, একটু মনোনিবেশপূর্ব্বক চিন্তা করিলে দেখিতে পাই—সেই শ্রুতির মধ্যে একটু পবিত্র ভাব বিরাজ করে। আমরা সাধারণতঃ উহা বিশ্বাসমূলক মনে করিতে পারি, কেহ কাহাকেও অন্তরের গুপ্ত বিষয় বিশ্বাসভাজন মনে না করিয়া প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হয় না প্রায়ই লোকে সহানুভূতি লাভের জন্য শোক তাপে, দুঃখে, রাগে বা আনন্দোচ্ছাসে আমাদের নিকট হৃদয় নিহিত সংবৃত কথা ব্যক্ত করিয়া থাকেন। আমরা উহা প্রকাশ করিয়া দিলে যেমন বিশ্বাসঘাতকতা—পাপে লিপ্ত হই, তেমনি যদি উহা বক্তার ভাষ্য ও ভাবের সঙ্গে ঐক্য করিয়া বলিতে না পারি, তাহা-হইলে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য আমরা মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হই।

কোন কোন লোক এমন তরলপ্রকৃতির যে, তাহাদের নিকট কোন কথা ব্যক্ত করিলে তাহারা উহা প্রাণান্তেও গোপন রাখিতে পারেন না—প্রকাশ করিয়া ফেলেন। এইরূপ সরল প্রকৃতির লোক গুপ্ত-বিষয়

প্রকাশ করিয়া কোনরূপ যশঃ বা লাভের প্রত্যাশা করেন না, অথবা এই শ্রেণীস্থ লোক মূর্খ নহেন যে, হঠাৎ ইহাদের মুখ হইতে কোন গুপ্ত সংবাদ অসাবধানতাবশতঃ বাহির হইয়া পড়ে, কিম্বা ইহারা বিশ্বাসঘাতক ও নহেন যে, একের কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করিয়া কোনরূপ সুখলাভের প্রত্যাশা করেন, ইহারা বড়ই সরল, তাই জগতের লোককে ও সরলতার প্রতিমূর্ত্তি মনে করেন, যখন উহাদের সরলতায় বিষ উদ্গীরণ করে, তখন উহাদিগকেও বিশ্বাসের পাত্র মনে করা কর্ত্তব্য নহে।

তাই বলিয়া কি গুণের কথা অপ্রকাশ থাকা কর্ত্তব্য? নীচ প্রকৃতির লোকই কোন ব্যক্তির গুণাংশের কথা অপরের নিকট প্রকাশ করিয়া দিতে সমুৎসুক হওয়া দূরে থাকুক—অপরের কোন গুণ দর্শন বা শ্রবণ করিয়া হিংসায় জর্জ্জরিত হইয়া থাকেন। ইহারা কদাপি আত্মকৃত দোষ স্খালিত করিয়া উন্নতির পথে প্রধাবিত হইতে যত্নপরবশ নহেন, পরন্তু অপরের উন্নতির পথে কণ্টক রোপণ করিয়া উন্নতিকামী ব্যক্তিবর্গের পথরোধকরূপে দাঁড়াইয়া থাকিতে লজ্জিত হয়েন না। এই শ্রেণীস্থ লোককে হৃদয় বিনির্ম্ময় করা ও বিষধর ভুজঙ্গ লইয়া ক্রীড়া করা তুল্য নয় কি? ইহাদের শঠতার জন্যই জগতে নানাপ্রকার মহা অনিষ্ট ঘটিয়াছে ও বর্ত্তমানেও ঘটিতেছে।

যখনই কোন ব্যক্তির গুণ অপরের আলোচ্য হয়, তখনই দেখা যায়, গুণালোকে হয়ত গুণ-গ্রাহী, গুণের আদর করিতে শিখিয়া গুণ-রাশির প্রতি সঞ্চালিত হইয়াছে, নতুবা সে কোন এক সময় সেই ব্যক্তিকর্ত্তৃক উপকৃত হইয়া চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিয়াছে। এই গুণালোচক ব্যক্তিগণ স্বাধীনচেতা, ইহারা মন্দ লোককে অসৎ কর্ম্মের জন্য ঘৃণা করিতে সঙ্কুচিত হয় না অথচ সেই অসৎ লোকই যদি কোন সময় সৎক্রিয়া করে, তাহা হইলে তাহাকে প্রশংসা করার সময় ও পূর্ব্বের দশ পাঁচটা অসৎ কার্য্যের স্মৃতি মনে করিয়া বর্ত্তমান সৎকার্য্যের প্রশংসা হইতে বিরত হয় না। আমাদের দেশে এই শ্রেণীস্থ লোক যত বৃদ্ধি হইবে, ততই এ দেশ মহত্ত্বের উচ্চ-স্তরে অধিরোহণ করিবে। ইহারা সমাজের হিতৈষী, সদনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক উদারচেতা, ও নির্ভীক, ইহাদের একটি অসাধারণ গুণ এই যে ইহারা যাহা বলে, তাহা সত্যের উপর অধিষ্ঠিত, তাই ইহাদের বাক্যাবলী ও পাপশূন্য, ভাবময় ও শিক্ষাপ্রদ পরের হৃদয় রাজ্যে ডুব দিয়া অন্তর্নিহিত গুণ-কুসুম চয়ন করার অধিকারী এ সংসারে বড়ই বিরল, যাঁহারা ভগবানের দিকে অধিক অগ্রসর নহেন, তাঁহারা কি পরগুণা-নুসন্ধিৎসু হইতে পারেন? ইহারা যে পরকে সদনুষ্ঠানের জন্য প্রশংসা করিয়া কেবল তাহাদের মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করেন, এরূপ বিবেচনা বা বিশ্বাস করা সঙ্গত নহে। যে সমস্ত জীবে বা পদার্থে গুণ বা অত্যধিক পরিমাণে অভিব্যক্ত সেই সব পদার্থ জীব তাহাদের নয়ন অমৃতরসে সিক্ত করে, কাজেই গুণের মোহনমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া ইহারা এতই আত্মহারা হয় যে, ঐ সমস্ত

গুণের কথা কে যেন তাহাদিগকে জগতের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দিতে উত্তেজিত করে, সে উত্তেজনার ফল এতই ভাবময় যে তখন ঐ গুণগ্রাহী ব্যক্তি গুণালোচনার সময় শত্রু ও মিত্র ভুলিয়া যান। ইহারা শ্রুত কথা অতিরঞ্জিত করিয়া প্রকাশ করেন না, কাজেই ইহাদের দ্বারা গুপ্তকথা প্রকাশের অতিরিক্ত প্রশংসা বা নিন্দার আশঙ্কা প্রায়ই থাকে না।

গুপ্তকথা সকলের নিকট প্রচার করা কর্ত্তব্য নহে। এই জন্য কেহ যেন সর্ব্বদা তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন না করেন, উহা অনেক সময় ভয়ঙ্কর দোষাৎপত্তির কারণ হয়। তুষ্টিম্ভাব সম্পন্ন ব্যক্তির প্রকৃতি এমনই নিকৃষ্ট যে কেহ যদি তাহাদের নয়নের সম্মুখে সহস্র পাপ করে, তাহা হইলেও উহারা বাধা দিতে পারে না। কখন বা পাপ কার্য্যকে সহানুভূতির চক্ষে দেখেন, কখন বা পাপ পথে কণ্টক রোপণ করিতে হইলে উহাদের লজ্জা ভয় বা সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়। গুপ্তকথা অপ্রকাশ থাকা কর্ত্তব্য, কিন্তু কাহারও সৎসাহস কিম্বা মানসিক বলের অপনয়ন শ্রেয়ঃ নহে। যিনি তুষ্ণীংশীল তিনিই জ্ঞানী নহেন। যিনি সৎসাহসী অথচ তুষ্ণীংশীল তিনিই প্রকৃত মৌনী বা জ্ঞানী।

কতকগুলি লোকের গুপ্তভাবই কর্ম্মসাধনের প্রধান উপায়। অর্থাৎ কোন কোন কার্য্য এত বিঘ্ন যে উহা প্রকাশ হইয়া পড়িলে কর্ম্মটি নিখুঁৎভাবে সম্পন্ন হয় না। ঐরূপ স্থলে কর্ম্মকর্ত্তা গুপ্তভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন। যাহারা ঈদৃশ কর্ম্মের সম্পাদক, তাহারা যেমন প্রত্যেক অনুষ্ঠেয় কর্ম্মই গোপনে সম্পাদন করেন, তদ্রূপ অন্যের বিষয়ও গোপন রাখিতে অভ্যস্ত হইয়া থাকেন, এই শ্রেণীস্থ লোক বিশ্বাসী উহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবেন।

প্রাচীনকালের লোকেরা বাকসংযমী ছিলেন। তাহারা কোন কথাই বিশেষ বিচার না করিয়া, উহার পরিণাম ফল চিন্তা না করিয়া অপরের কর্ণগোচর করিতে কৌতূহলাক্রান্ত হইতেন না। ইউরোপেও কোন সময়ে এই সুনিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। দার্শনিক পণ্ডিতগণ বাক্‌সংযমকে একটা তপশ্চর্য্যার মধ্যে গণনা করিতেন। পিথাগোরাস একজন দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন, তিনি তাহার ছাত্রগণকে শিক্ষা প্রদান করিবার পূর্ব্বে বর্ষাধিক কাল বাক্‌সংযমাভ্যাস শিক্ষা প্রদান করিতেন। যে সব ছাত্র তাঁহার উপদেশ প্রতিপালনের যোগ্য হইত, তাহারা অবশেষে দুর্ভেদ্য দর্শন শাস্ত্রের পটাবরণ ভেদ করিয়া উচ্চ বিষয় শিক্ষা করার প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইত। যাহারা সে নিয়ম পালনের অযোগ্য বিবেচিত হইত, তাহারা অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্র হইলেও পিথাগোরাসের নিকট উপেক্ষিত হইত।

যখনই তুমি কাহারও নিকট কোন গুপ্ত কথা প্রকাশ করিতে অভিলাষী হও তখনই ধীর ও সংযতভাবে চিন্তা করিয়া দেখিও — সে কথাটি প্রকাশ করার জন্য কেন তুমি উৎসাহিত হইতেছ। অনেক সময় এইরূপ চিন্তা করিয়া দেখিলে অবশ্য প্রতীতি জন্মিবে যে, তোমার গুপ্তসংবাদ মুখনিঃসৃত হওয়ার পূর্ব্বে তুমি প্রকাশকের চক্ষে যতটা নয়নানন্দ বর্দ্ধক ছিলে, প্রকাশ করিয়া ঠিক সে অবস্থায় আর বিরাজ করিতে পারিতেছ না। হয়—তাহার চক্ষে তুমি সহস্র চন্দ্রপ্রফুল্ল-রজনীর ন্যায় দীপ্তিপূর্ণ প্রতীতি হইবে, নতুবা অন্ধকারময়ী অমানিশার রজনীর ন্যায় তমসাচ্ছন্ন অনুভূত হইবে।

হইলেই বা অপরের নিকট নযন তোষণ তাহাতেই বা কি? আত্ম-প্রশংসা লাভের জন্য গুপ্ত সংবাদ প্রচার করিতে ব্রতী হওয়া কি নীচত্ত্বমূলক নহে?

প্রকৃতই যদি তোমাকে কাহারও নিকট সংবৃত-কথা প্রকটিত করিতে বাধ্য হইতে হয়, তুমি যাহার নিকট প্রকাশ করিবে—সে তোমার কিরূপ হিতাকাঙ্ক্ষী বিশেষ বিচার করিয়া দেখিও। গুপ্ত-সংবাদ বহনের পাত্র এ জগতে বড়ই স্বল্প। যিনি পরিণামদর্শী, লোকহিতৈষী, সুখ-দুঃখ-স্পর্শ-সমজ্ঞানী, প্রলোভন বা মাযার অতীত তিনিই তোমার বিশ্বাস স্থাপনের উপযুক্ত পাত্র। অনেক সময় একটি বিশ্বাসপূর্ণ বাক্য ও একটি জীবন তুল্য মূল্যবান একটি জীবনের ভার যেরূপ সকলে বহন করিতে সক্ষম নহে, তদ্রূপ কি একটি বিশ্বাসপূর্ণ বাক্যের ভার সকলে বহন করিতে অসমর্থ নহে? যে স্থলে অযোগ্য পাত্রে বিশ্বাস স্থাপিত হয, সে স্থলে বিশ্বাসঘাতকতার ফলে মূল্যবান জীবনটীও বিসর্জ্জন দিতে হয। বাক্যের সঙ্গে যখন জীবনের এত নিগুঢ় সম্বন্ধ, তখন যে প্রাচীন-কালের লোকেরা বাক-সংযমী হওয়ার ব্যবস্থা করিতেন, তাহা কি অন্যায্য ও ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয়?

অনেকে প্রিয়জনের নিকট গুপ্তরহস্য প্রকাশ করিয়া সাতিশয সুখানুভব করেন। প্রিয়জনের হৃদয় কি বাস্তবিকই গুপ্তরহস্য স্থাপনের উপযুক্ত স্থল? এ জগতে এখনও অনেক মনস্বী ও বিশ্বপ্রেমিক আছেন, তাঁহারা যোগ্য, অযোগ্য, পণ্ডিত, মূর্খ, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক সকল শ্রেণীর লোককেই সমভাবাপন্ন মনে করিয়া হৃদযটা পরের সেবায় উৎসর্গ করিয়া প্রফুল্লিত হয়েন। তিনিও যদি সকলের নিকট অক্ষুদ্ধান্তঃকরণে জীবনের গুপ্ত-রহস্য প্রকাশ করিয়া দেন, তাহা হইলে অনেক সময় তাঁহাকেও অনতিক্রমনীয় বিপদে পতিত হইতে হয়।

আমরা অনেককে ভালবাসিতে পারি, কিন্তু গুপ্তসংবাদ অনেকের নিকট প্রকাশ করিতে পারি না। অনেকেই অবগত আছেন—ম্যাকবেথ তাহার পত্নীকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন, তাহার পত্নীও তৎপ্রতি সাতিশয় অনুরক্ত ছিল। ম্যাকবেথ যখন ডাকিনীর কথায় বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া স্কটলণ্ডের সম্রাট ডনকানকে নিহত করিয়া তাহার সিংহাসন অধিরোহণে সংকল্প করিয়াছিল তখন কে তাহাকে সেই অতি নিষ্ঠুর পৈশাচিক নবহত্যায সাহায্য করিয়াছিল? তাহার পত্নী। তাহার ভোগৈশ্বর্য্য-লোলুপা, ইন্দ্রিয়-পরাযণা পত্নীই সেই ভীষণ কার্য্যে ম্যাকবেথকে উত্তেজিত কবার জন্য ওজস্বী বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল। বীর ম্যাকবেথের কর্ণে উহা বিষম শ্লেষপূর্ণ প্রতীতি হইয়াছিল, ম্যাকবেথ আর দুঃসাহস-সম্পন্না, অবিচলিতা পত্নীর নিকট কাপুরুষ সাজিয়া ঘৃণাস্পদ হইতে রাজি হইল না। সে ডনকানকে একদিন অতিথি বেশে গৃহে প্রাপ্ত হইযা অতি নিষ্ঠুর ভাবে নিহত করিয়াছিল। কে বলিবে ম্যাকবেথ ও তাহার পত্নীর মধ্যে ভালবাসা ছিল না? প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল বলিয়াই ম্যাকবেথ তাহার পত্নীর নিকট হৃদয়-সংগোপিত অতি নিদারুণ ভাব প্রকাশ করিয়াছিল। তাহার স্ত্রী ম্যাকবেথের ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে না তাকাইয়া আপাত সুখের প্রত্যাশায় ম্যাকবেথকে সাংঘাতিক কার্য্যে অনুপ্রাণিত করিযাছিল।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নির্দ্ধারণাক্ষম ম্যাকবেথ ভার্য্যার মনস্তুষ্টির জন্য নরকে পতিত হইতে বিন্দুমাত্র ভীত হইল না। অথবা সাহস করিয়া বলিতে পারি, দুশ্চারিণী ম্যাকবেথ-পত্নীর নিকট যদি ম্যাকবেথের অভিলাষ প্রকাশিত না হইত, তাহা হইলে ম্যাকবেথ এত পাষাণান্তঃকরণের পরিচয় দিয়া পিশাচ সাজিতে পারিত না। যাহাকে আন্তরিক ভালবাসা যায, সে যদি আত্মার ভবিষ্যত

জীবনের সুখ শান্তির দিকে দৃষ্টি না করে তাহা হইলে গুপ্ত কথা প্রকাশের ফলে সেও কি ম্যাকবেথপত্নীর ন্যায় আমাকে কুহকিনী মায়ায় ভুলাইয়া বিপদ জালে জড়িত করিতে পারে না? ম্যাকবেথ-পত্নী যদি ধার্ম্মিকা ও পরিণাম দৃষ্টি-শালিনী, সংযতারমনী হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ম্যাকবেথের শোচনীয় পতন ঘটিত না। তুমি যখনই কাহারও নিকট গুপ্ত রহস্য প্রচার করিতে উৎসাহী হইবে, তখনই দেখিবে শ্রোতার লক্ষ্য সেই মহানের দিকে নিবদ্ধ কি না? যদি মহানের দিকে নিবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে তুমি অনায়াসে গুপ্ত সংবাদ অভিব্যক্ত করিতে পার। তোমার প্রস্তাবিত বিষয় গুলি যদিও পাপ-স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলেও তোমার বিপদের আশঙ্কা নাই, সাধুশ্রোতা তোমাকে সৎ পরামর্শ প্রদান করিয়া কুপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন। আর যদি তিনি তোমার অপেক্ষা নীচ অন্তঃকরণের লোক হয়েন তাহা হইলে গুপ্ত অভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য তুমি যে কয়েক পদ নিম্ন সোপানে অবতরণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছ, তদপেক্ষা সহস্র পদ নিম্নে পতিত হওয়ায় তোমার যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে।

এ সংসার একটা নাট্য মঞ্চ, মানুষ অভিনেতা মাত্র। যে সৎক্রীয়াশীল, তাহার অভিনয় শিক্ষাপ্রদ, যে অসৎ-কর্ম্ম-পরায়ণ তাহার অভিনয় সকলের নিকট তুল্য শিক্ষণীয় নহে। যে যে প্রকার কার্য্য করিবে, এ জগন্মুকুরে তাহার সেইরূপ একটা ছায়া প্রতিবিম্বিত থাকিবে। কুক্রিয়ান্বিত লোক অনেক সময় পাপাচরণ করিয়া পাপটী হৃদয়াভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টিত হইয়া থাকে, উৎকট পাপ কেহ কোন দিন চাপিয়া রাখিতে পারিয়াছে কি? আমাদের অন্তরের ভিতর যিনি সাক্ষী স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছেন তাঁহার নিকট আমাদের গোপনীয় কিছুই নাই। তিনি সদনুষ্ঠানের জন্য লোককে পুরস্কৃত করিয়া থাকেন, অসদনুষ্ঠানের জন্য যথোচিত তিরস্কৃত করিতেও তিনি কখন নিরস্ত নহেন। তুমি ধনী হও, নির্ধনী হও, তুমি সুরূপ হও, কুরূপ হও, তুমি শক্তিমান হও, বা শক্তিহীন হও, মনুষ্যের বিচারে তুমি পাপের যথোচিত দণ্ডপ্রাপ্ত না হইতে পার, কিন্তু অন্তরের ভিতর যিনি বিরাজমান, তিনি কখনই তোমার অপরাধের বিচারে নিবৃত্তি নহেন।

কোন উৎকট পাপ করিয়া গোপন করিতে অভ্যস্ত হইলেই যে অন্যায়াচরণের দণ্ড হইতে মুক্তি লাভ করা যায়, এ কথা নিতান্ত অমূলক। এ জগতের কর্ণ তোমার পাপের কাহিনী হইতে বধির হইলেও তোমার উদ্ধার কোথায়? তুষের ভিতর অগ্নি থাকিলে যেমন ভিতর হইতে ক্রমশঃ তাহার দাহিকা শক্তি প্রকাশ পায়, তেমনি অন্তরনিহিত গুপ্ত পাপরাশি হৃদয়ের প্রান্তদেশ মর্ম্ম-চ্ছেদি যাতনায় দগ্ধ করিয়া থাকে। কেহ কেহ পাপের গ্লানী হইতে অব্যাহতি পাওয়ার নিমিত্ত নানারূপ চিত্ত-স্ফূর্তিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, ঐরূপ ক্ষুদ্র উপায় দ্বারা কিছু কালের জন্য অনুশোচনার আক্রমণকে নিস্তেজ করা যাইতে পারে। কিন্তু যখন তাহার অনুরূপ পাপের জন্য পাপীকে প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতে হয়, তখন তিনি অশেষ চেষ্টায়ও অনুশোচনার আক্রমণকে ব্যর্থ করিতে পারেন না। এই বিষয়ের একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

হ্যামলেটের পিতৃব্য হ্যামলেটের পিতাকে গোপনে বিষপ্রয়োগ দ্বারা নিহত করেন ও হ্যামলেটের মাতাকে অঙ্কশায়িনী করার জন্য অতি দ্রুত তাহার সহিত বিবাহিত হয়েন। হ্যামলেট তাহার পিতার হঠাৎ মৃত্যু ও আহার মাতার পাশবিক বিবাহ দর্শন করিয়া তাহার পিতৃব্য ও মাতার চরিত্রের প্রতি সন্দেহ করিলেন। হ্যামলেটের পিতৃব্য হ্যামলেটের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া নির্দ্দোষ প্রমানীত হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

হ্যামলেট তাহার পিতার প্রেতাত্মার নিকট শুনিলেন যে তাহার পিতৃব্য তাহাকে বিষ-প্রয়োগে হত করিয়া তাহার পত্নীকে বিবাহ করিয়াছেন। সত্যনিষ্ঠ হ্যামলেট কেবল প্রেতাত্মার বাক্যের উপর নির্ভর না করিয়া উন্মত্ততার ভাণ করিয়া প্রকৃত তথ্যজানার জন্য ব্যস্ত রহিলেন।

এজন্য তিনিও দেলিয়ার দুর্দমণীয় প্রলোভন পর্য্যন্ত জয় করিলেন। হ্যামলেটকে হঠাৎ উন্মাদগ্রস্ত দেখিয়া হ্যামলেটের পিতৃব্য ক্লোডিয়াস নানারূপ সন্দেহ হৃদয়ে স্থান দিতে বাধ্য হইলেন। তাহার প্রধান মন্ত্রী পরামর্শ দিলেন যে ওফেলিযাকে কপটাচারিণীর বেশে সাজাইয়া এক নির্জ্জন স্থানে রাখিয়া দিলে ও হ্যামলেটের প্রতিমোহিনীমায়া বিস্তার করার জন্য ওফেলিযাকে পরামর্শ দিলে, নিশ্চয়ই হ্যামলেট প্রণযাসক্ত ওফেলিয়াকে নির্জ্জনে পাইয়া তাহার প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ করিবে, সেই সময় সে প্রকৃত উন্মাদ কি না পরীক্ষা করা যাইবে। এই পরামর্শ কার্য্যে পরিণত করার জন্য ক্লোডিয়স ও তাহার মন্ত্রী এক নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া উভয়ের কথাবার্ত্তা শ্রবণ মানসে ওফেলিয়াকে যথোপযুক্ত সজ্জিত করিলেন, ও মন্ত্রী ওফেলিয়াকে হ্যামলেটের প্রতি কাপট্য প্রকাশের পরামর্শ দিতে লাগিলেন। নীচমনা ক্লেডিয়াস ওফেলিয়ার প্রতি মন্ত্রীর কাপট্যোপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহার স্বকীয় কাপট্যের জন্য মনে মনে তীব্র তিরস্কার করিয়া বলিলেন।

Oh, .tis is too true !
How smart a lash that speech doth give my conscience !
The withered cheek, beautified with plastering art,
Is not more ugly to .the thing that helps it.
Than is my deed to my most painted word ·
O heavy burthen !

ক্লোডিয়সের এই খেদপূর্ণ বিলাপ শ্রবণ করিযা কেনা বলিবে যে উৎকট পাপ গোপন, ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধ অতএব মনুষ্য শক্তির অতীত।

সহ-সম্পাদক।

---

# ভরা ভাদরে।

এবার খুলিনু তরী
ভরা ভাদরে।
নদী ভরা বুকে বুকে,
ভেসে যাব মন সুখে,
ফিরিতে হবে না ঠেকে
বালুকা-চরে।
এ নহে গো নিদাঘের
ক্ষীণা তটিনী
থামিয়া গিয়াছে গান,
মরুময় হৃদি খান,
পদে পদে পেয়ে বাধা
মরে অমনি,;

এ যে বরষার শেষে
পরাণ পোরা
প্রেম ভরে টলমল,
উছলিল ছল ছল,
আপন প্রাণের বেগে
ছুটেছে ত্বরা।
সেই স্রোত বেগে ধায়
আমার তরী,
নাহি কোন বাধা ভয়,
আষাঢ় শ্রাবণ নয়,
ভ্রুকুটী করে না ঘন
গগন ঘিরি।

কবে থেমে গেছে ঝড়
নিদাঘ-সনে,
নির্ম্মল নীলাকাশে
শরতের শশী হাসে,
সারাটা জগৎ ভাসে
জোছনা-স্নানে।
পূবিলে পূরিতে পারে
প্রাণের আশা,
সবি হেরি অনুকূল,
উপজিব সে অকূল,
তাহারি অসীম বুকে
বাঁধিব বাসা।

সাগর সাবস সম
অভয় বুকে,
উপেক্ষিয়া সবাকায়,
উত্তরোল ঝড় বায়,
লহরেব তালে তালে
নাচিয়া সুখে,
ঘুমাযে পড়িব সেই
শীতল বুকে।

শ্রীতারা প্রসন্ন ঘোষ।

---

# যোগ্যতার কথা।

নিবিড় তিমিবাবৃত সুদীর্ঘ অমা-বজনীব অবসানে বিহঙ্গ-কূজন-মুখরিত, প্রফুল্ল প্রসূনপুঞ্জ পরিশোভিত বিশ্ব-বিতানে দাঁড়াইয়া যদি কেহ বলে, তরুণ অরুণের কনক কিরণ-স্পর্শে অচিবে সমগ্র জগৎ সঞ্জীবিত ও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে না, তবে তাহাব সেই অদূব-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত বাক্য যেমন সর্ব্বথা অবিশ্বাস্য, তাহার বুদ্ধিব প্রাগর্ভ্য যেমন সর্ব্বতোভাবে উপহাস্য ; তদ্রূপ আজ যাহাবা এই আশু-জাগবিত, উত্থান-প্রযাসী মহাশক্তির বোধনোন্মত্ত জাতিব সম্মুখে দাঁড়াইযা দৃপ্ত-কণ্ঠে অতি বুদ্ধিমানের মত বলিতেছে, "তোমরা স্বাযত্ব শাসন বা স্ববাজের উপযুক্ত নহ, তোমাদেব এ আস্ফালন 'বামন হইযা চাঁদে হাত' দেওয়ার মত নিস্ফল কল্পনা মাত্র" আমবা কিছুতেই তাহাদেব কথা বিশ্বাস কবিযা লইতে কিংবা তাহাদের মার্জ্জিত বুদ্ধিব প্রশংসা করিতে পারি না।

মানুষ যে পর্য্যন্ত কোন একটা বস্তুর অভাব তীব্র ভাবে অনুভব কবিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত তাহার উপযুক্ত হইতে পারে না। যদি বা কখন সৌভাগ্যক্রমে সেই সাধন-দুর্ল্লভ পদার্থ অযাচিত ভাবে হস্তগত হয়, তবে সে তাহাব যথাযোগ্য সম্মান ও ব্যবহার কবিতে পাবে না, বানব হস্তে মুক্তামালাব ন্যায় অচিবে তাহা অনাদরে ও অপব্যবহারে বিধ্বংস হইযা যায়। আজ আমবা স্বাযত্ব শাসন ও স্ববাজের অভাব তীব্রতর ভাবে অনুভব করিতেছি, যদি আমরা তাহার উপযুক্ত না হইতাম, তবে কখনই আজ আমাদের প্রাণ তাহার জন্য এমন ব্যাকুল ও উৎসুক হইযা উঠিত না—স্বাযত্ব শাসন ও স্ববাজের নামে আমাদেব নির্জীব অন্তঃকবণে এমন বিদ্যুত-প্রবাহ ছুটিত না। আমাদেব অভাবের তীব্রতা, আমাদিগকে জলদ গম্ভীব স্ববে বলিয়া দিতেছে, আমরা স্বায়ত্ব শাসন বা স্ববাজেব অনুপযুক্ত নহি ; আমাদের

---

* বিগত ১৩১৫ সালে "ভাণ্ডারেব" সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ চৌধুবী মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান যে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা স্ববাজ অথবা স্বায়ত্ব শাসন পাইবার উপযুক্ত কিনা? এই প্রবন্ধটি তদুত্তরে লিখিত হইযাছিল। কিন্তু অকস্মাৎ "ভাণ্ডার" প্রচার বন্ধ হইয়া যাওয়ায় প্রবন্ধটী যথা সমযে মুদ্রিত হইতে পাবে নাই।

(লেখক)

কর্ম্ম কঠোর হস্তে উহাদের অন্যায়-অপব্যবহারের কোন আশঙ্কা নাই।

স্বায়ত্ব-শাসন বা স্বরাজ প্রার্থীদের যে সমুদয় গুণ থাকা প্রয়োজন, আজ যাহারা আমাদিগের মধ্যে সে সকল গুণের অভাব দেখিতেছেন, তাঁহাদিগকে বোধ হয় এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে, বাজা রাজ্য-ভার স্বহস্তে লইয়াই তাহার দোষ-দুর্ব্বলতা সংশোধন করিবার অবসর পাইয়া থাকেন, তৎপূর্ব্বে সহস্র ইচ্ছা সত্বেও তাঁহার সে ক্ষমতা থাকে না। ব্রীড়াবনতা নব বধূ মহা মহিমাময়ী 'গিন্নীর পদে বৃতা না হইলে প্রকৃত গৃহস্থালী শিখিবে কোথা হইতে?' আমবা স্বায়ত্ব শাসন বা স্বরাজ না পাইলে আমাদের মধ্যে যাহা কিছু দোষ-দুর্ব্বলতা আছে, তাহা নানাকারণে সম্যক দূরে থাকুক, আংশিকরূপেও সংশোধিত হইতে পারে কি না, তদ্বিষযে গভীর সন্দেহ আছে।

পক্ষান্তরে পরীক্ষার্থী অর্জ্জুনের লক্ষ্য-স্থৈর্য্যের ন্যায় আমাদের চরম-লক্ষ্য যদি সর্ব্বদা স্বায়ত্ব শাসন ও স্বরাজের দিকে থাকে, যদি নিয়ত স্বায়ত্ব-শাসন বা স্বরাজের ন্যায় মহৎ আদর্শ আমাদের সম্মুখে প্রদীপ্ত রহে, তাহা হইলে আমবা কায়মনোপ্রাণে সেই লক্ষ্য ভেদ করিবার জন্য, সেই মহৎ আদর্শ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, আমাদের সমগ্র শক্তি অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিবে, পার্থিব কি অপার্থিব কোন প্রতিবন্ধকতাই আমাদের পবিত্র সাধন-পথে দাঁড়াইতে পারিবে না। পরন্তু স্বরাজ কি স্বায়ত্বশাসন সম্বন্ধে আমরা যদি পূর্ব্বাহ্ণেই আপনাদের অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া হতাশ্বাস হইয়া পড়ি তবে আমরা চিরকাল 'যে তিমিরে সে তিমিরেই রহিযা যাইব, স্বয়ং বিধাতা পুরুষ আসিযাও আমাদের কাল-অদৃষ্ট-স্রোত ফিবাইতে পারিবেন না।

বর্ত্তমান যথেচ্ছাচারের যুগে সুযোগ ও সুবিধার নানা অভাব সত্বেও আমরা দেখিতে পাই, যে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিভা সম্যভাবে স্ফুরিত হইয়া থাকে। আমাদের দাদাভাই, সুরেন্দ্র নাথ, রবীন্দ্রনাথ জগদীশ চন্দ্র, কেশব চন্দ্র, সুরেশ বিশ্বাস প্রমুখ মহাত্মাগণ ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এমত অবস্থায় আমরা রাষ্ট্র তন্ত্রে আমাদের ঈপ্সিত অধিকার প্রাপ্ত হইয়া জাতীয় উন্নতির যাবতীয় অন্তরায় দূব করিতে সক্ষম হইলে, সকল বিষযে আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা লাভ হইবে না এমন কথা কে সাহস করিয়া বলিতে পারে?—

আমি স্বায়ত্ব-শাসন অপেক্ষা স্বরাজের সমধিক পক্ষপাতী। স্বায়ত্ব শাসনে মনুষ্যত্বের উন্মেষ এবং মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে। পরমুখাপেক্ষী হইয়া কখনো স্বরাজ লাভ করিতে পারা যায না। আমাদের সাধনায় দৃঢ়তা থাকিলে, মাতৃ-ভূমির বাস্তব পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা একদিন' স্বরাজ" লাভ করিবই ইহা ধ্রুব সত্য।

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

## স্বপনের দেখা।

কে তুমি ঘুমের ঘোরে গোপনে
প্রীতির মোহন মালা
গলে তুলে দেও বালা,
এত যতনে ;
ফুটিবে কি ফুল আশা কাননে ?
ক্ষণেকের দেখা দেও
দূরে সরে কথা কও
ছার জীবনে,
৮ চারিটী কথা দেও স্বপনে।
সকল যাতনা ভুলে
মায়া-মোহ পদে ঠেলে
সুখ-গগনে,
ঢেকেছি নৈরাশ্যময় বসনে।
রয়েছ অনন্ত দুর
সেও ভাল সেও মোর
সুখ জীবনে,
কে বলেরে সুখ প্রিয়-মিলনে
ক্ষণেকের দেখা সেও স্বপনে।

শ্রীগোপীনাথ বর্ম্মণশিং।

## উচ্ছাস।

বলিব বলিয়া যাই প্রতিদিন,
নীরবে তাহার কাছে ;
মনে হয় ভয় বলিতে পাবি না
বেদনা লাগে বা পাছে।
তাই—হৃদয়ের জ্বালা হৃদয়ে লুকাযে
দূরেতে আসিয়া সবে',—
কুঞ্জ হ'তে তারে দেখি ফিরে ফিরে
থাকিয়া মরমে মরে '।
যামিনী হইলে চাঁদে বুকে করে
কুমুদিনী হেসে মরে,
হৃদয়ে আমার বেদনা উছলি'
ভেসে যায় আঁখিনীরে।
আমি—সারাটী রজনী, দেখিবারে তারে
আপনা হারায়ে যাই,
মনে হয় মোর নিখিল সংসারে
সে বিনা কেহই নাই।
তাই—দূরে হেথে হেরি, গুমুরিয়া মরি
স্মরিযা পুরাণ স্মৃতি,
অতীতের কথা গভীর মমতা
সরসা-মধুর প্রীতি !
ওগো—তার মুখপানে, চাহিয়া শুধুই
কাটায়ে কতই নিশি,
ঊষা আগমনে, ফিরে আসি ঘরে
নয়নের নীরে ভাসি।
সেত—স্বপনের মত এসে চলে যায়
বারেক না চায় ফিরে,
আমি—পাগলেব মত সারা দিবারাত
কাঁদি কেন তারি তরে।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ চন্দ্র।

---

উপহারের কথা।—আমাদের উপহার পুস্তক ৪খানি যথা—তাপস-কুমার, লহরী, রমা, ঝঙ্কার" প্রস্তুত হইযাছে। আমরা ক্রমে ক্রমে সকলের নামে ভিঃ পিঃ করিতেছি। পুস্তক ৪খানি যে অতি উপাদেয় হইয়াছে ; তৎসম্বন্ধে বঙ্গের কৃতবিদ্য মহাত্মাগণের মতামত দ্রষ্টব্য। তদ্ব্যতীত গ্রাহকগণ পুস্তকগুলি পাঠে মহা সন্তুষ্ট হইয়া যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, স্থানাভাবে তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। ক্রমশঃ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। অতঃপর যাহাদের ভিঃ পিঃ গ্রহণ করিতে অমত আছে, তাহারা সত্বর পত্র দ্বারা জানাইবেন। পূজার সময় স্ব স্ব পোষ্ট আফিসে ঠিকানা পরিবর্ত্তনের বন্দোবস্ত করিবেন।

# শারদী-নিশায়।

হের প্রিয়ে, শান্ত শশী গেল অস্তাচলে,
থাকিতে পূর্ণিমা-যামী, সেই তুমি সেই আমি
বসিয়া থাকিতে এই সেফালিকা তলে!
গাঁথা ত হয়নি মালা, নিভেনি ত প্রাণ-জ্বালা,
বহেনি ত বায়ু হায়, তেমনি শীতলে?
এখনো ফলেনি মুক্তা, নব-দূর্ব্বাদলে!
একি হেরি?—কভু হেন শুনিনি ত হায়,
শরতের পূর্ণ শশী, সুনীল আকাশে বসি'
ধাতার নিয়ম লঙ্ঘি' অস্তাচলে যায়!
কখনো জানিনি জ্ঞানে, পূর্ণিমার বিদ্যমানে,
প্রগাঢ় তিমিরে হেন অবনী ডুবায়,
হেন অপরূপ আর দেখিনি কোথায়!
জানি আমি শশি, তুমি কুমুদ রঞ্জন,
সরলা সুশীলা সতী, কুমুদিনী গুণবতী,
তোমার প্রণয় শুধু করে আকিঞ্চন;
তা'রে তুমি অবহেলে, কোন্ প্রাণে চ'লে গেলে
বিরহ-অনলে হায়, করিয়া দহন?—
এই কি প্রেমের রীতি,—স্বার্থ-বিসর্জ্জন?
আজি এ শারদী নিশা, বিমল গগন,
ছিনু আমি প্রিয়া সনে, নিকুঞ্জে প্রফুল্ল মনে,
হেরিতে প্রকৃতি-লীলা প্রিয়-দরশন!
অতীত, ভবিষ্য ভুলে, আশা ছিল হৃদি খুলে,
আনন্দে প্রাণের কথা কহিব দু'জন,
তুমি অস্তাচলে কেন করিলে গমন?
কেন শশি, অস্তাচলে করিলে প্রয়াণ?—
এ হেন নিদয় হ'য়ে, সুখ, শান্তি, প্রীতি ল'য়ে,
আবরি ম্লানতা-জালে প্রেয়সী-বয়ান?
এখনো ফুটেনি ফুল, গুঞ্জরেনি অলিকুল,
ছোটেনি তটিনী সুখে, ধরি' কল তান,
হেন অসময়ে কেন ছাড়িলে বিমান?
শুনেছি ধাতার রাজ্যে নাহি অবিচার;
যে যাহারে সদা চায়, সে তা'রে সতত পায়,
তবে কেন হেরি হেন অরীতি তোমার?
তোমারি আশায় এসে, ভুঞ্জি কেন অবশেষে,
সুখ পৌর্ণমাসী-কালে অভেদ্য আঁধার?
এ নহে তোমার শশি, সাধু ব্যবহার!

শ্রীঅটল বিহারী দাস।

---

# আবাহন।

আয় মা আনন্দময়ি নিরানন্দ বঙ্গে।
কাঁদিছে বাঙ্গালি আজি প্রাণের আতঙ্কে॥
সঙ্গে লয়ে গজানন আর সে কার্ত্তিকে॥
ত্বরা করি এস গো মা অভয়ে চণ্ডিকে॥
তোমার বিহনে আজি বাঙ্গালী জীবন।
হইয়াছে কণ্ঠাগত করি অনশন॥

দাও গো হৃদয়ে বল ওমা নিস্তারিণী।
অন্নদানে তাহাদের বাঁচাও পরাণী॥
তোমার সহায় বিনা কেমনে তরিব।
অন্ন বিনা সত্য কিম্বা মোরা মারা যাব?
তব লীলাক্ষেত্রে এই ভারত মাঝারে।
মরিবে কি সুতগণ এবে অনাহারে॥
অপাঙ্গে কর মা দৃষ্টি ভারতের পানে।
পরিণত নহে হবে ভীষণ শ্মশানে॥
অভয় প্রদান কর জননী অভয়া।
কেমনে তরিব মোরা বিনে পদছায়া॥
স্বদেশী সংগ্রাম হ'তে তার মা তারিণী।
বিষম সঙ্কট কাল আগত জননী॥
এখনো পরীক্ষা কি মা বাকি আছে আর।
ভাসিছে ভারতবাসী অকুল পাথার॥
কায়মনে ডাকি তাই জননী তোমায়।
এ অকূলে কবে পাব দিয়ে পদাশ্রয়॥
যদি দয়া মহামায়া কর অতঃপর।
দাঁড়াতে পারি মা তবে পায়ে দিয়ে ভর॥
স্বদেশে সেবিলে পুনঃ মন অভিলাষ।
পূর্ণিত হইবে, যাবে সমুদায় ত্রাস॥
হেরম্বে লইলে কোলে ঐ হেমবরণী।
সগণে আইলা বঙ্গে সঙ্গে শূলপাণী।
বাধবে হৃদয় পুনঃ করে মার নাম।
অভয়া অভয় দানে পুরাইবেন কাম॥

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

## অন্ন-সমস্যা।

আবার বুঝি ভারতে কালের ভেরী বাজিয়া উঠিল। আবার বুঝি শস্যশ্যামলা বঙ্গ-ভূমির উর্ব্বর ক্ষেত্র ফল শস্য প্রদানে বিমুখ হইল। সুজলা সুফলা বঙ্গ বুঝি দুর্দৈবের অভিশাপে আবার নির্জ্জলা নিস্ফলা হইয়া শ্মশান-প্রেতের আবাস-ভূমি হইয়া পড়িল। দেশের মহাত্মাগণ দেশের নানারূপ সমস্যার পূরণে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক এবং ধর্ম্মনৈতিক, নানা সম্বন্ধই নব নব বেশ ধারণ করিয়া তাঁহাদের নিকট জটিল হইতে জটিলতর ভাবে উপস্থিত হইতেছে। তাঁহারা তাহাদের সমাধানে দণ্ডায়মান হইয়া বাহ্যজগৎ ভূলিয়া গিয়াছেন। নাগরিক অট্টালিকাবেষ্টিত ক্ষেত্রস্থ তাঁহারা আর গ্রাম্যপ্রান্তর বেষ্টিত আমাদের দৃষ্টি একইরূপে কার্য্য করিতেছে না; তাই আমরা যে সমস্যায় জীবন মরণের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' রবে নিস্ফল চীৎকার করিতেছি, সে সমস্যাটা তাঁহাদের নিকট অপেক্ষাকৃত হীন বলিয়াই বোধ হয় প্রতিভাত হইতেছে। পড়িয়া শুনিয়া জানা এবং স্বচক্ষে দেখিয়া অনুভব করিয়া জানার মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট। সহরে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা অল্প বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। সুতরাং খাদ্য সামগ্রী দৌর্ম্মূল্য নিবন্ধন তাঁহাদের বিশেষ কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে না, যদিইবা কিছু হয় তবে সেটা বিলাসিতার উপকরণ সমষ্টির মধ্য হইতেই খরচের দিকে বাদ হইয়া যাইতেছে মাত্র; সুতরাং তাঁহারা দেশের অন্ন সমস্যার বিষয়ে মুখে ও কাগজ কলমে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিলেও প্রাণে প্রাণে সেটা অনুভব করিতেছেন বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। কিন্তু আমরা পল্লীবাসী সাধারণ গৃহস্থ ভদ্রলোক ও কৃষকমণ্ডলী-ক্ষেত্র মাত্র সম্বল। পৈত্রিক চ'দশ

বিঘা খামার জমি আছে তাহার উৎপন্ন হই-তেই জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, অথবা অন্যের জমি বর্গাসত্বে লইয়া চাষবাস দ্বারা পরিবার প্রতিপালিত হয়, গ্রামের প্রায় ষোল আনা লোকই এই দলের। গ্রামবাসীদিগের মধ্যে সেবা-বৃত্তিধারীগণ তো নাগরিকই হইয়া গিয়াছেন তাঁহাদের কথা না ধরিলেও চলে; কিন্তু আমরা যাহারা এখনও সেই পৈত্রিক ভিটা ধরিয়া, পৈত্রিক জমা জমি মাত্র সম্বল লইয়া এই সব বিজন অরণ্যে ম্যালেরিয়ার সহিত যুদ্ধ করিয়া কোনরূপে জীবন যাপন করিতেছি, আমাদেরই দেখিতেছি—"প্রাণ রাখিতে হয় যে প্রাণান্ত" অন্নরক্ষিণীসভার প্রতিষ্ঠা হইতেছে, ধর্ম্মগোলা স্থাপিত হইতেছে, কাগজ পত্রে দেখিতেছি, এবং তাহা পাঠ করিয়া বুক-ভরা আশা লইয়া সংসারের দিকে তাকাইতেছি—আর মনে মনে ভাবিতেছি এইবার দুঃখ ঘুচিবে, কিন্তু বাজারে চাউলের দোকানে যখন চাউলের মূল্য ৬৲ হইতে ৬।০, তাহা হইতে ৬॥০ এ উঠিতেছে, আরও উঠিবে বলিয়া ভয় দেখাই-তেছে, যখন নূতন আউস মোটা ধান টাকায় ১৩ সের আর আমন ধান টাকায় দশ সের এগার সেরের বেশী পাওয়া যাইতেছে না দেখিতে পাই, তখন বুকের রক্ত শুকাইয়া যায়, বুকের ধুকধুকানি পর্য্যন্ত থামিয়া যায়।

তখন কোথায় থাকে স্বরাজ, কোথায় বা স্বায়ত্ত শাসন, কোথায় যায় কংগ্রেস কোথায় যায় কন্‌ফারেন্স! মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িতে হয়। আর কি করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিব, কিরূপে জীবন ধারণের উপায় করিব—এই চিন্তাই প্রবল হইয়া পড়ে আর সেই চিন্তা একেবারে আর সব চিন্তাকে ডুবাইয়া দেয়, তাই বলিতে-ছিলাম যে আর সব সমস্যা অপেক্ষা অন্ন সমস্যাই বড় গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর এই সমস্যার পূরণ ভালরূপে না হইলে সব সমস্যাই অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে অন্ন চিন্তায় যদি মন সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকে, তবে সে মনে অন্য চিন্তা কিছুতেই স্থান পাইতে পারে না। এ কথা আমরা কাগজে কলমে বেশ বুঝিতেছি ও বুঝাই-তেছি বটে কিন্তু আসলে কিছুই করিতেছি না।

দেশের অন্ন বিদেশে চলিয়া যাইতেছে, সে জন্য তো অন্নাভাব হইতেছে, তারপর দৈব-বিপাকও বড় কম নহে। যদি বর্ষা বা বৃষ্টি না হইল, তাহা হইলেই হাহা-কার। এই সব দৈব-দুর্গতি নিবারণের উপায় বঙ্গের শস্যক্ষেত্রে প্রয়োগ না করিলে যে ভরা ক্ষেতে উপবাস করিতে হয় তাহার দৃষ্টান্ত আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি।

এই বৎসর নিম্ন বঙ্গে অনেক স্থানে ধান্য এমন সুন্দর জন্মিয়াছিল যে কৃষক ক্ষেতের দিকে তাকাইয়া ভবিষ্যৎ আশার মোহিনী বাণীতে মুগ্ধ হইতেছিল, দশবৎসরের মধ্যেও সে ক্ষেত্রে এমন ধান দেখে নাই, কিন্তু হা দুর্দ্দৈব, কোন কোন স্থানে অসময়ে বন্যা হইয়া সব ধান ডুবিয়া গেল! কোথাও বর্ষা একেবারেই না হওয়ায় ধান সব লাল হইয়া শুকাইয়া গেল।

উভয়দিকেই কৃষক এবং মালিক সমান

ভাবে নিরাশা হইল। ভগবান্ কি উদ্দেশ্যে যে এইরূপ আশা দিয়া নিরাশ করিতেছেন তাহা আমরা বুঝি না,—জানি না। কিন্তু আমাদের বুদ্ধি এবং কষ্ট করিবার শক্তি থাকিতেও ইহার প্রতিবিধানের কোন উপায় হইতে পারে কি না, তাহারও কোন চেষ্টা করি না।

যতদিন বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই সব দৈবী-আপৎ দূর করিবার উপায় না হইতেছে, যতদিন উন্নত প্রণালীর কৃষি দ্বারা দেশের জমিতে উপযুক্ত শস্যাদি উৎপাদনের চেষ্টা না হইতেছে, ততদিন কৃষক কুলের অবস্থা ভাল হওয়ার আশা আকাশকুসুম মাত্র।

দেশের মহারথীগণ রাজনৈতিক অধিকার লইয়া যে পরিমাণে মত্ত আছেন,তাহার কিয়দংশ শক্তিও যদি মনে প্রাণে ইহাতে লাগাইয়া দিতেন, কেবল ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন এবং সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ ও সমালোচনা দ্বারা ঐ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। দেশের যুবকগণ বিলাতী বর্জ্জনে ভলেণ্টিয়ার হইয়া খাটিতে খুব ক্ষিপ্র কিন্তু তাঁহাদের শতকরা এক জনকেও এই অন্ন সমস্যা নিবারণকল্পে ভলেণ্টিয়ার হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে দেখা যায় না। হুজুগে মাতা আর কাজ করা এ দুটি এককথা নহে।

দেশে খাদ্য দ্রব্যাদির মূল্য অসম্ভব রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে, আমাদের মতে চাউলের দর বৃদ্ধিই তাহার প্রধান কারণ, চাউল যদি সস্তা হয়, তাহা হইলে তদনুপাতে অন্যান্য জিনিসও নিশ্চয়ই সস্তা হইবে। আর খাদ্যদ্রব্য সস্তা হইলে দেশের লোকের মন এই এক প্রধান ভাবনার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া অন্য দিকে ভাবিবার অবসর পাইবে

পূর্ব্বে দেবতা অতিথি প্রভৃতির সেবায় লোকের আগ্রহ ছিল, এখন তাহার অভাব হইয়াছে, তাহার কারণ সমূহের মধ্যে খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধিও অন্যতম প্রধান কারণ। নিজেই খাইতে পাইনা তা অন্যদিকে তাকাইব কেমন করিয়া।

দরিদ্র ব্যক্তির মন নিজের ভাবনায় এমন ব্যস্ত থাকে যে, তথায় অন্যের জন্য ভাবনার স্থান একেবারেই থাকে না।

অন্নাভাব ক্লিষ্ট আমাদেরও কিসে পরিবার বর্গের প্রতিপালন করিতে পারিব, কিসে নিজ মান সম্ভ্রম বজায় রাখিতে পারিব, এই চিন্তায় অহর্নিশ ব্যস্ত থাকিতে হয় বলিয়া আমাদের অন্য চিন্তাতে মন বসে না। অন্ন চিন্তা চমৎকারা। ইহা মানুষকে পাগল করিয়া তুলে; সাধুকে অসাধুতে পরিণত করে। যার নিজের জন্য বিশেষ ভাবিতে হয় না, সেই পরের জন্য ভাবিবার অবকাশ পায়।

এজন্য আমাদের মনে প্রাণে আমাদের এই প্রধান সমস্যা পূরণ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা পাওয়া উচিত। যে উপায়ে দেশের শস্য ক্ষেত্র সমূহকে সম্পূর্ণ দৈবের উপর নির্ভর করিতে নাহয়,তাহা স্থির করিয়া, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্যও রীতিমত প্রণালী নির্দ্দিষ্ট করা কর্ত্তব্য। স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য, স্বদেশী মাহাত্ম্য প্রকটনের জন্য যেরূপ সমবেত চেষ্টা হইতেছে, প্রামি-

গ্রামে মণ্ডলী স্থাপনের প্রস্তাব চলিতেছে. এই অন্ন সমস্যা পূরণের জন্যও সেইরূপ কতকগুলি লোক নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহাদের কার্য্য প্রণালী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহার জন্য অর্থের প্রয়োজন যথেষ্টই আছে তাহা সংগ্রহের জন্যও চেষ্টা হওয়া বাঞ্ছনীয়। দেশের নায়কগণ যদি ইচ্ছাকরেন তাহা হইলে অর্থ সংগ্রহে বিলম্ব হয়না, তাঁহারা যদি দেশের লোককে বেশকরিয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন যে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট উপায়ে দেশের শস্য সম্পত্তি বৃদ্ধি পাইবে, তাহা হইলে তাহা কার্য্যে পরিণত করার জন্য ধনী দরিদ্র সকলেই যথা সাধ্য অর্থ সাহার্য্যে অগ্রসর হইবেন। এ প্রবুদ্ধ ভারতে কর্ম্মী সকলেরও বোধহয় অভাব হইবেনা। সকলের নিকটই করযোড়ে নিবেদন করিতেছি যে—তাহারা এবিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া যাহাতে এই অন্ন সমস্যার সমাধান হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করুন কথায় বলে—"আপনি বাঁচিলে বাবার নাম" নিজেরা খাইয়া না বাঁচিতে পারিলে, দেশের উন্নতি কি মৃতদেহ লইয়া হইবে?—

শ্রীযদু নাথ চক্রবর্ত্তি বি, এ।

---

## এস মা ভারতে।

আবার সেই শরৎকাল। ত্রেতাযুগের যে শরৎকালে রঘুবীর রামচন্দ্র রাক্ষস-বংশ নির্ব্বংশেরজন্য ভক্তি-প্রাবল্যে মহামায়ার অকাল-বোধন করিয়াছিলেন; নিজ কমল-অক্ষি বিশালাক্ষীর পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া অসীম শক্তি-মত্ত হইয়াছিলেন—ইহা সেই শরৎকাল। সেই শরৎকালে শারদীয়ার আগমনে প্রকৃতি হাস্যময়ী। আপৃথিবী আনন্দ-কোলাহল মুখরিত। ধর্ম্মবীর বাঙ্গালী কি সেই স্মৃতি, সেই পরম পবিত্র স্মৃতি কখন ভুলিতে পারে? তাই তাহারা প্রতি বৎসর ঠিক এই সময়ে হৃদয়ের সমস্ত বিষাদ অবসাদ ভুলিয়া—সানন্দ-চিত্তে মহামায়ার বোধন-মন্ত্র গাহিয়া থাকে।

আমাদের ছয় মাসে দেবতাদের একদিন, অপর ছয় মাসে এক রাত্রি অর্থাৎ পূর্ণ এক বৎসরে তাঁহাদের একদিন বা অহোরাত্র। এই নিমিত্ত আশ্বিন মাস দেবতাগণের রাত্রির মধ্যে গণনীয়, কাজেই দেবী নিদ্রিতা, তাই তাঁহাকে জাগরিতা করিবার জন্য বোধন মন্ত্র গাহিতে হয়। ভগবান রামচন্দ্র রক্ষোকুল নির্ম্মূল করিয়া প্রজাগণের হিত-সাধনের জন্য ব্রহ্মার আদেশে অকালে শক্তির আরাধনা করিয়া অসীম শক্তি-সঞ্চয় করিয়াছিলেন। শাস্ত্র বলিতেছেন:—

ঐঁ রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি
কৃতঃ পুরা।
অহমপ্যাশ্বিনে ষষ্ঠ্যাং সায়াহ্নে বোধয়ামি তে।
ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষায় বরদা ভব শোভনে।
শক্রেণ সংবোধ্য স্বরাজ্যমাপ্তং তস্মাদহং ত্বাং
প্রতিবোধয়ামি।

যথৈব রামেণ হতো দশাস্যস্তথৈব শক্রন্
বিনিপাতযামি।
দেবি চণ্ডাম্বিকে চণ্ডি চণ্ড বিগ্রহকারিণি
বিল্বশাখাং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠ দেবি যথাসুখং ॥

কই মা মঙ্গলময়ি! ত্রেতার শরতে রাক্ষস-বংশ নিধনের জন্য অভয়ারূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলে,আর আজ এই কলির শরতে তোমার আদরের পুত্রগণ যে নানা প্রকারে ভীত,ত্রস্ত্য মর্ম্মাহত। তাহাদিগকে রক্ষা করিতে তাহাদিগকে অভয়দানে পরিতোষ করিতে আর কি মা অপাঙ্গ-দৃষ্টি করিবি না? দুর্ভিক্ষ মহামারী, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসগণ করাল মুখব্যাদান করিয়া তোর সাধের ভারত-ক্ষেত্র গ্রাস করিতে বসিয়াছে। মা প্রসন্নময়ি! ভারতবাসীকে এই সমস্ত ভীষণ বিভীষিকা হইতে রক্ষা করিতে আর কি কৃপাদৃষ্টি করিবি না মা?

দেশ সকল প্রকারে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। প্রতিবৎসর দুর্ভিক্ষ, প্লেগ, কলেরা বসন্ত প্রভৃতিতে কত লোক শমন-সদনের অতিথি হইতেছে। এক দুর্ভিক্ষ হইতেই যত অনিষ্টের উৎপত্তি হইতেছে, অনাহারে জীর্ণ দেহ সন্তানগণকে আক্রমণ করিতে, দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিয়া অনায়াসে আপন প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সে কিছুতেই পশ্চাৎপদ নহে, প্রতি বৎসর অসংখ্য নরনারী তাহার করাল দংষ্ট্রে নিষ্পেষিত হইয়া অকালে কাল-কবলে নিপতিত হইতেছে। তোমার অধিষ্টানক্ষেত্র, অন্নপূর্ণার লীলানিকেতন ভারতে অন্নাভাবে লোক মরিতেছে, ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের ও পরিতাপের বিষয় আর কি আছে মা? ত্রেতায় রামচন্দ্র তোমার পরম ভক্ত ছিলেন, প্রজার প্রতিও তাঁহার পুত্রাধিক স্নেহ ছিল; রাজার কর্ত্তব্য তিনি ভালরূপ বুঝিতেন। তাই প্রজাপীড়নকারী রক্ষোশত্রু ধ্বংসের জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়া ছিলেন, নিজ স্বার্থ বলি প্রদান করিয়া অরণ্যবাসের অসীম কষ্ট সহ্য করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তখন দেশে রাজা ছিল, এখন ও আছে, দেশ রাজাশূন্য হয় নাই। এখন দেশে যাঁহারা রাজা বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, প্রজার প্রতি তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টি নাই। প্রজা-পীড়নকারী ঐ সকল রাক্ষস-বিনাশে তাঁহাদের কিছুমাত্র চেষ্টা নাই, নিস্বার্থভাবে প্রজা-রক্ষায় তাহাদের তাদৃশ যত্ন নাই বরং প্রজা উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে বলিয়া অহঃরহঃ তাহাদের দমনের চেষ্টা করিতেছেন। প্রজা কেন উচ্ছৃঙ্খল হইতেছে, কেন তাহারা দিকদ্বিক জ্ঞানশূন্য হইতেছে, তাহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান না করিয়া কেবল দমনের চেষ্টা করিলে যে কি ফলোদয় হইবে তাহা ত মানব-বুদ্ধির অতীত। মা! রাজা ত দেখিলেন না; এখন তুমি রাজার রাজা,ত্রিলোকের অধীশ্বরী,তুমিই এখন আমাদের আশা ও ভরসা। তুমি অন্নপূর্ণা অভয়ারূপে আবির্ভূতা হইয়া ভারতে পদার্পণ না করিলে,তোমার অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র,এই দেববাঞ্ছিত ভারত শীঘ্রই শ্মশানে পরিণত হইবে। মা! শস্য-শ্যামলা-কানন-কুন্তলা ভারত, যাহার ফলে-শস্যে আপৃথিবী জীবগণ জীবিত, তাহার অধিবাসীগণ উদর পুরিয়া চারিটী খাইতে পায় না;. পরিবার তরে একখানা কাপড় পায়

না—যে ভারত তোমার আশীর্ব্বাদে চিরকাল 'দুধে ভাতে' থাকিত; তোমার কৃপায় যাহারা এই কোকিল-কুল-কুজিত, আনন্দোচ্ছাস-প্লাবিত ভারতের তপোবনে তোমার ধ্যানে তন্ময় থাকিত, আজ তাহাদের এ দুর্গতী কেন মা? যথায় অনায়াস-লব্ধ বা সামান্য আয়াস-সাধ্য উপায়ে সকলে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত, যেখানকার প্রকৃতি ফল-জলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার যোগাইত, আজ সেই দেশের চির-উর্ব্বর জমি, শুষ্ক, মরুভূমি-প্রায়। প্রজাকুল আহারাভাবে ধ্যস্ত-বিধ্বস্ত, নতুবা এত রোগশোকে জর্জ্জরীভুত হইয়া প্রতি বৎসর অসংখ্য লোক মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতেছে কেন। শ্মশানের আর বাকী কি মা? মা শ্মশানকালিকে! এই ভারতের মহা-শ্মশানে চামুণ্ডারূপে অবতীর্ণ হইয়া চণ্ডমুণ্ড বিনাশ কর, আমাদের সর্ব্বস্বার্ত্তি হরণ করিয়া অভয় প্রদান কর। ভারতের মহাশ্মশান আজ তোমার দেববাঞ্ছিত পদার্পণে স্বর্গের মণি-মন্দিরের ন্যায় শোভা ধারণ করুক। মা! আবার সেই ধর্ম্মের সুদিন আনিয়া দে; আবার আনন্দ-কোলাহলে ভারত-ভূমি প্লাবিত হউক, ভারতের লোক ভারতের চির-সংস্থান অন্ন-সংস্থানে রত হউক, ভারতের চাষা বুক-ভরা আশা লইয়া অঙ্গনে আনন্দ-আল্পনা প্রদান করুন। ভারতচাষার দেশ বলিয়া যেন আবার গণ্য হয়। তখন চাস-বাস করিয়া আমরা যে সুখে ছিলাম, এখন তাহার শতাংশের এক অংশও হয় না, শরতের শস্য-পূর্ণ শ্যামল-বসুন্ধরা, আর তেমন করিয়া তোমার আগমন-ঘোষণা করে না, শরতের প্রকৃতি আর তেমন করিয়া হাসিরাশি মাখিয়া মানব মনে অতুল আনন্দ প্রদান করে না। যেন সমস্তই বিসদৃশ ভাবে বিভোর, মা চৈতন্য-ময়ি! তাহাদের চৈতন্য সম্পাদন কর,চৈতন্য-ময়ীর কৃপায় তাহারা যেন চৈতন্যময় হইয়া স্বদেশ-প্রীতি হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে পারে; স্বদেশী দ্রব্যে পুনরায় যেন তাহাদের রুচি হয়। আবার যেন আমরা নিজ ধনে ধনী হইয়া স্বগর্ব্বে মস্তক উন্নত করিতে পারি। আয় মা! ভারতের মহাশ্মশানে আসিয়া তোর ভীত ত্রস্ত সন্তানগণকে অভয় দান কর। আয় মা সারদে! আজ শরতে তোর অকৃতি সন্তানগণ প্রাণ ভরিয়া তোর পূজা করিবে, ভক্তি গদ গদ চিত্তে মা মা বলিয়া তাপিত মনপ্রাণ জুড়াইবে। আয় মা আয়! আজ সকাম-ভাবে তোর ভবারাধ্য চরণ পূজা করিয়া আমরা ধন্য হই; ভবের সকল ভাবনা হইতে পরিমুক্ত হই; ত্রেতার শরতে রাবণ বধের জন্য ভগবান রামচন্দ্র সকাম ভাবে তোমার আরাধনা করিয়াছিলেন, সাবর্নি মন্বন্তরে সুরথ রাজাও হৃত রাজ্য পুনঃ-প্রাপ্ত হইবার জন্য সকামভাবে তোমার পূজা করিয়াছিলেন। আমরাও আজ দুর্গতীনাশের জন্য তোমার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। মা দূর্গতীনাশিনি! এখন তোমার ভবভয়ে ভীত, বুভুক্ষিত সন্তানগণের দুর্গতি নাশ করিয়া অভয় দান কর। মা! সন্তানবৎ-সলে! সন্তানগণের দুরবস্থা দেখিয়া আর নীরবে থাকিও না; জীবন-সংগ্রামে তাহারা জর-জর মর মর; তোমা হেন শক্তিস্বরূপিণী জননী বর্ত্তমানে সন্তানগণের এত দুর্দ্দশা কেন

মা। মা আমাদের দুর্দশার একশেষ হইয়াছে; তোমাকে ভুলিয়া আমরা পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতেছি। মা! আজ সুখের শরতে, তোমার আগমনে মমুর্ষ দেহেও আবার যেন জীবন সঞ্চার হইতেছে। আবার আমরা উঠিয়াছি, আবার আমরা জাগিয়া তোমার চরণে পুষ্পাঞ্জলী প্রদানের জন্য হৃদয়ের কপাট খুলিয়া মা ভক্তিভরে তোমার চরণ-প্রান্তে পতিত; মা! তোমার অধঃপতিত, বিড়ম্বিত সন্তানগণকে ক্ষমা কর; প্রসন্না হইয়া তাহাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর; তাঁহাদের সকল ভাবনা, সকল যন্ত্রণার অবসান হউক। ভাই ভারতবাসী। আজ সুখের শরতে শারদীয়ার আগমনে বিশ্বময় আনন্দ প্লাবন, আনন্দ প্লাবনে চারিদিক প্লাবিত, আর সময় নষ্ট করিও না, তোমার সাধের চণ্ডিমণ্ডপ আজ ত্রিদিবের অধিষ্ঠাত্রী, বিশ্বজননীর পদার্পণে স্বর্গের বিমল বিভায় বিভাষিত। এস ভাই, গললগ্নীকৃতবাসে ক্ষেমঙ্করীর চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিঃ—

"জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তুতে॥
মধুকৈটভ বিধ্বংসি বিধাত্রি বরদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি
দ্বিষো জহি॥

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।

মা! আজ গঙ্গাজল বিল্বদলে তোমার ভবারাধ্য অভয় চরণ পূজা করিয়া আমাদের জন্ম সার্থক, ক্রিয়া সার্থক হইল। তুমি আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া ইহ পরকাল নিস্তার কর,—"রক্ষ মাং সর্ব্বতোদেবী বিশ্বেশ্বরী নমোঽস্তুতে।" মা নিস্তারিণি। আমাদের সকল যন্ত্রণার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া আমাদের নিস্তার কর। মা অন্নপূর্ণে! তোমার সন্তানগণকে উদর পুরিয়া অন্ন প্রদান কর; অন্নাভাবে আজ আমরা জীর্ণ শীর্ণ; এই ক্ষুধিত পুত্রগণকে অন্ন দে মা অন্নদে! অন্নপূর্ণার সন্তান অন্নাভাবে মারা যাইবে, তুমি সন্তান বৎসলা মা হইয়া কেমন করিয়া দেখিবে মা?

মা! প্লেগ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া সোণার ভারত শ্মশানে পরিণত করিতে বসিযাছে। মা! অসুরনাশিনি! আজ অসুরগণকে নাশ করিয়া তাহাদের রক্ষা কর; তোমা ভিন্ন তাহাদের রক্ষা করিবার আর কেহ নাই; আমরা সম্পূর্ণভাবে তোমার শরণাগত; এই শরণাগত দীনার্থ ভারতবাসীকে তুমি না রক্ষা করিলে আর কে রক্ষা করিবে মা!

শরণাগত দীনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবী নারায়ণি নমোঽস্তুতে।

মা সর্ব্বমঙ্গলা! তুমি কলির শরতে ভারতে আবির্ভূতা হইয়া আমাদের মঙ্গল বিধান কর, আমরা আর যেন তোমাকে বিস্মৃত না হই; যেন অহঃরহ তোমার মুক্তিমূলাধার পাদপদ্ম হৃদয়ের অন্তঃস্থলে রাখিয়া ভক্তিভাবে পূজা করিতে পারি। এস ভাই হিন্দু এস ভাই পবিত্র চিত্ত সাধু বঙ্গবাসী! আজ আমরা ভবের ধন ভবানী চরণে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করিয়া যুগ্মকরে, তারস্বরে বলিঃ—

সর্ব্ব মঙ্গলা মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

সম্পাদক।

# স্বাস্থ্য-বিধান।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং।"

অতি প্রাচীনকাল অবধি প্রধান প্রধান শরীর তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ স্বাস্থ্যবিধান উদ্দেশে যে সকল মঙ্গলজনক উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা জনসমাজের মহোপকার সাধন করিয়া আসিতেছেন, মহাকবি কালিদাস সেই সমুদায়ের সার-ভাগ উপরি উদ্ধৃত শ্লোকাংশের দ্বারা সম্যক্ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বস্তুতঃ ধর্ম্ম-সাধন * জন্য শরীরই আদ্য প্রয়োজনীয় পদার্থ। সুস্থ শরীর-সুস্থ মন, অক্ষত শরীর—অক্ষত মন—ইহাই প্রকৃতির অবিচলিত নিয়ম। অতএব যিনি রোগ † হীন তিনিই সম্যক ধর্ম্মানুষ্ঠানে সিদ্ধকাম হইবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? যাঁহার শরীর একে বারে রোগশূন্য, তাঁহারই উদ্যম অধ্যবসায়, মনঃসংযম, স্থির প্রতিজ্ঞা, জ্ঞানার্জ্জন, চিত্তশুদ্ধি,—এই সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানের,—কর্ত্তব্যসাধনের প্রধান উপায় গুলি বিশিষ্টরূপ স্ফূর্ত্তি লাভ করে ও অচিরাৎ আশাতীত সুফল ধারণ করে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, আমাদিগের দেশে দিন দিন জ্ঞান ও সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যবিধানের প্রতি কৃতবিদ্য সমাজের ততদূর আস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইউরোপে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের বহুল অনুশীলন প্রযুক্ত উত্তরোত্তর লোক সংখ্যা সমধিক বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও, মানুষ পূর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘায়ু হইতেছে, এবং জীবনের সুখ স্বচ্ছন্দতা দিন দিন বাড়িতেছে ভিন্ন কমিতেছে না। কিন্তু আমাদিগের দেশে মনুষ্যের আয়ু ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে বলিয়াই স্পষ্ট প্রতীতি হয়। কোথায় উত্তরোত্তর রোগাদির উপশম হইয়া জীবন সুখের আবাসভূমি হইবে, না প্রতিদিন এক এক উৎকট রোগ আসিয়া সমগ্র বাঙ্গালাকে জর্জ্জরীভূত করিয়া তুলিতেছে। দুই শতাব্দী অতীত হইল ইংলণ্ডে এক মহামারীভয় উপস্থিত হয়, এবং তাহাতে সহস্র সহস্র লোক এককালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় বহুজনাকীর্ণ লণ্ডন নগর এক বিস্তীর্ণ শ্মশান ভূমিতে পরিণত হয়। এখনও এক শত বৎসর অতীত হয় নাই, ইংলণ্ডে বৎসরে শত শত লোকের ম্যালেরিয়া জ্বরে প্রাণ বিয়োগ হইত, কিন্তু এক্ষণে ইংলণ্ডের জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য তত্ত্বের বহুল বিস্তার হওয়ায় এই সকল ভয়ানক রোগ ইংলণ্ড হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে ম্যালেরিয়ায় এখন আর প্রায় মরিতে দেখা যায় না। পূর্ব্বে ইংলণ্ডের অসংখ্য নাবিকগণ স্কর্বি (Scurvy) রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইত, কিন্তু এক্ষণে ঐ রোগ ইংলণ্ডের নাবিক সম্প্রদায়ের মধ্যে আর নাই বলিলেই হয়। এমন কি টাইফস্ (Typhus) বসন্ত (Small pox) ও ভীষণ যক্ষা

* ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষানাম্ মূল মুক্তং কলেবরং তচ্চ সর্ব্বার্থ সসিদ্ধৈ ভবেৎ যদি নিরাময়ং। চরক।

† রোগ চতুর্ব্বিধ যথা স্বাভাবিক, অসাম্তক, কায়িক, এবং মানসিক।

রোগেরও ভয়ানক ভাব ইংলণ্ডে অনেকটা প্রশমিত হইয়া আসিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ জেনর (Sir Wiliam Jenner) কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত গোবীজ টীকার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হওয়া অবধি বসন্ত রোগের করাল কবল হইতে শত শত লোক পরিত্রাণ পাইয়াছে; এবং পরিষ্কৃত বায়ু সেবন ও অপরাপর স্বাস্থ্য বিধায়ক নিয়ম পালন দ্বারা কাশরোগীদের আয়ুঃবৃদ্ধি ও জীবন অপেক্ষাকৃত সুখসেব্য হইয়াছে।*

ইংলণ্ডে স্বাস্থ্য বিদ্যার প্রকৃষ্ট উন্নতি প্রযুক্ত এইরূপে জীবনের সুখ স্বচ্ছন্দতা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে; কিন্তু আমাদিগের মধ্যে ঠিক তাহার বিপরীত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; আমরা প্রতিনিয়ত এত অধিক স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মাদি লঙ্ঘন করিয়া থাকি যে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আমরা যে জানিয়া শুনিয়া এইরূপে প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া থাকি তাহা নহে; অনেক সময়ে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মাদি সবিশেষ জ্ঞাত না থাকাতেই আমরা এরূপ প্রমাদ পূর্ণ কার্য্য করিয়া ফেলি, আমাদিগের অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তিকেও স্বাস্থ্য নীতির মূল সূত্রের বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে দেখা যায়। তাঁহাদিগের এরূপ আচরণ কেবল স্বাস্থ্য শাস্ত্রে সম্যক্ জ্ঞান না থাকার ফল। আমাদিগের দেশীয় বিচারক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বহুমূত্র রোগ এত প্রবল তাহার কারণ কি?—তাহার কারণ, মানসিক পরিশ্রমের অত্যন্ত আধিক্য ও শারীরিক পরিশ্রমের একেবারে অভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেবল যে হাকিম দিগের মধ্যেই এইরূপ স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া থাকে তাহা নহে; শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশই এই স্বাস্থ্য ভঙ্গ দোষে দোষী। কি উকিল, কি চিকিৎসক, কি শিক্ষক, কি কেরাণী সকলেই অনবরত মানসিক শ্রম ও চিন্তায় অভিনিবিষ্ট, উপযুক্ত শারীরিক পরিশ্রমের নাম ও নাই,—এমন কি অনেকের ভাগ্যে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে পবিত্র বায়ু সেবনও ঘটিয়া উঠে না। এদিকে আবার আজি কালি খাদ্য দ্রব্যাদি এত দুর্ম্মূল্য যে সামান্য শ্রমজীবীদের প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর আহার জুটিয়া উঠা ভার এবং ইহার সহিত আবার তাহাদের অত্যধিক পরিশ্রম, অপরিষ্কৃত ও দুর্গন্ধময় স্থানে বহুজনে একত্রে বাস, অপরিষ্কৃত আহার ও পান প্রভৃতি দোষ একত্রে মিলিত হইয়া আমাদের দেশকে নানা রোগের লীলাভূমি করিয়া তুলিয়াছে। ম্যালেরিয়া ও বিসূচিকা আমাদের গৃহে গৃহে সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে এবং যক্ষ্মারোগ আমাদিগের মধ্যে দিন দিন স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে। এদেশে "প্লেগ" নামক আর এক সংক্রামক ব্যাধি আসিয়া দেখা দিয়াছে; প্রতিবৎসর কতশত দেশীয় লোক ইহার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। অপরিমিত স্বাস্থ্যহানীকর স্থানে বাস, কদন্ন আহার বা অনাহার; এবং পরিমিত পরিশ্রমের অভাব ইত্যাদিই ইহার কারণ; নতুবা কয়জন ইংরাজ এই রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে?

আমাদিগের মধ্যে ক্রমে যেমন সভ্যতার বিস্তার

হইতেছে, আমরাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার চির-সহচর অহিতকর প্রথা গুলিকেও বিশেষ প্রশ্রয় দিতেছি। দেশীয় মাদক দ্রব্যের উপর আবার বিলাতী মদ্য আসিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে। এই সমুদায় কারণে ক্রমশঃ আমাদিগের শরীর ও মন নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে, এবং আমরা সময়ে সাবধান না হইলে আরও অমঙ্গলের সম্ভাবনা। এরূপ ভয়ানক অবস্থার একমাত্র প্রতিকার স্বাস্থ্য—বিষয়ক নিযমাদি বিশিষ্ট-জ্ঞান, এবং আমাদিগের দৈনিক কার্য্য-কলাপে ঐ সমস্ত নিয়ম পালন, যাহাতে, জন-সাধারণে স্বাস্থ্য রক্ষার মূল সূত্রগুলি শিক্ষা করিতে পারে; সে বিষয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যত্নবান হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিরূপ নিয়মে থাকিলে, অথবা কি কি অনিয়ম না করিলে, আমাদিগের শরীর নীরোগ সুস্থ ও সবল থাকে এবং মন প্রফুল্ল ও তেজস্বী হয়, তাহা সবিশেষ জ্ঞাত হওয়া প্রত্যেক মনুষ্যেরই যে একান্ত প্রয়োজনীয় ইহা বলা বাহুল্য মাত্র আজিকালি বিদ্যালয় সমূহে শরীর পালনাদি স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক পুস্তক প্রচলিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের বচনাতীত হিতসাধন করিয়াছেন, এবং গবর্ণমেণ্টের সহিত দেশীয় কৃতবিদ্য ও ধনাঢ্য লোকেরা যোগ দান করিলে জল নির্গমন প্রণালী (Drainage) প্রভৃতি স্বাস্থ্য বিধানের অনেক স্থায়ী উপায় অক্লেশে সাধিত হইবে এরূপ ভরসা করা যাইতে পারে।

যে সকল নিয়ম পালন করিলে শরীর ও মন যথোচিত স্ফূর্ত্তিলাভ করে, সেই সকল নিয়ম সবিশেষ বিবৃত করাই স্বাস্থ্যশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। যে বায়ু আমরা প্রতি নিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া থাকি, যে জলও খাদ্যদ্রব্য আমাদের জীবনের অবলম্বন; যে ব্যায়াম ও অঙ্গসঞ্চালন ব্যতিরেকে আমাদের শরীর ও মন নিশ্চেষ্ট ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, যে বিশ্রাম ও নিদ্রা যথাকালে, যথা নিয়মে উপভোগ করা জীবনের একটী প্রধান প্রয়োজনীয়, যে গৃহে আমাদিগকে পিতা মাতা কন্যা পুত্র লইয়া সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিতে হয়, যে পবিত্র বিবাহ বন্ধনের উপর আমাদের জীবনের সুখ দুঃখ আশা ভরসা নির্ভর করে,—সেই সমুদায়ই স্বাস্থ্যশাস্ত্রের বিষয়ীভূত। কিসে রোগাদির উৎপত্তি এবং কি উপায়েই বা ব্যাধির আক্রমণ এককালে নিবারিত হইতে পারে, তাহা নিরূপণ করাও স্বাস্থ্যশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। সংক্ষেপে, যাহা কিছু আমাদিগকে স্বস্থ—আত্মস্থ করিতে পারে, যাহা কিছু আমাদিগের স্বাভাবিক নীরোগ অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিতে না দেয় এবং ঐরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে তাহা অপসারিত করিয়া আমাদিগকে প্রকৃতিস্থ করে, তাহাই স্বাস্থ্য শাস্ত্রের অন্তর্গত। শরীর সুস্থ না থাকিলে যে কার্য্যই কর, তাহাতে সুফল লাভের সম্ভাবনা অতিঅল্প। অতএব কি ধর্ম্ম কর্ম্ম, কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল বিষয়েই স্বাস্থ্য একান্ত আবশ্যক। এই জন্য স্বাস্থ্য রক্ষা সকলেরই প্রয়োজন। আমাদের দেশের স্বাস্থ্যের প্রতি কাহারও তাদৃশ দৃষ্টি নাই বলিয়া আমাদের এত দুর্গতি, যতদিন ইহার প্রতি আমাদের মনঃসংযোগ না হইবে ততদিন আমাদের উন্নতির আশা সুদূর পরাহত। আং সাং।

# আটহাজার টাকা।

( ১ )

তখন আমি মেডিকেল কলেজে পড়ি। Fifth year শেষ হইতে না হইতেই বাবা আমার বিবাহের জন্য এমন উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন যে আমি কোনমতেই তাঁহাকে আঁটিয়া বাখিতে পারিলাম না। মাঘমাসের প্রথমেই একদিন একটি প্রকাণ্ড দেহবিশিষ্ট ভদ্রলোক আসিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন, এবং সম্বন্ধটা প্রবল হইয়া গেল দেখিয়া আনন্দে বাবার মুখশ্রী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

আমি শুনিলাম যাহার সহিত আমার বিবাহ হইবে সে মেয়েটা শ্যামবর্ণা।—তখনই স্বীয় অসামান্য বুদ্ধিবলে বুঝিতে পারিলাম যে সেটা বাজে কথা - ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ আট হাজার টাকার খাতিরে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণে পরিণত হইয়াছে। আমার মানশ্চক্ষের সমক্ষে বেগুনীরঙের চেলীতে আপাদমস্তক ঢাকা একটি কৃষ্ণবর্ণা বালিকা-বধু আবির্ভূতা হইয়া আমাকে সাবধান করাইয়া দিল যে এ বিবাহ কিছুতেই হইতে পারে না। সাত বৎসরের কল্পনা একেবারে ভাসিয়া যাইবে?

মাকে বলিলাম—মা, এখন আমি কিছু-তেই বিয়ে ক'র্‌তে পার্‌ব না। মা জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন? আমি তখনই বলিলাম তা হলে এ বৎসরটাই আমার মাটী হবে—আমি আর এগজামিন দিতে পার্‌ব না।

মা সে কথা বাবাকে বলিলেন—শুনিয়া বাবা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, বলিলেন "বিয়ে দিলেই এ বৎসরটা মাটি হবে? ছেলে আমার কি বিদ্বান গো! ও ছেলের আর বিদ্যায় কাজ নেই—এখন আমি যার যোগাড় কচ্ছি তাই হোক।"

মাঘ মাস শেষ হইয়া আসিল—বিবাহ উপলক্ষে প্রত্যহই দুই একজন করিয়া আত্মী-য়ের শুভাগমন হইতে লাগিল। আমিও ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলাম। অবশেষে যে দিন বৈকালে বাবা গাত্র-হরিদ্রার বাজার করিতে এবং তাঁহার একজন বিশেষ বন্ধু একদল ব্যাগপাইপের বায়না দিতে বাহির হইলেন, সেইদিন সন্ধ্যার পর আমি নেক-টাইয়ের উপর ব্রোচ আঁটিয়া একেবারে হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। পাঞ্জাব মেলের একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়া উপরের "বেঞ্চে" এমন করিয়া আশ্রয় লইলাম যে নিতান্ত সহজে কেহ আর আমার সন্ধান পাইবে না।

ট্রেণ ছাড়িলে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। অনেক রাত্রে কখন মধুপুরে আসিয়া পৌছিয়াছি তাহা জানি না, তখনও আমার যথেষ্ট ঘুম-ঘোর আছে, এমন সময় কে একজন আমার নাম ধরিয়া ডাকিল। নিদ্রিতাবস্থায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে আমি বাড়ী হইতে পলাইতেছি, এটা যে বাড়ী নহে, গাড়ী, তাহা তখন আমার বোধ ছিল না—সেই খোলা বেঞ্চে শুইয়াই আমার বোধ হইতেছিল যেন বাড়ীর বিছানাতেই শুইয়া আছি। সুতরাং আমি কণ্ঠস্বরে

উত্তর দিয়া ফেলিলাম। তৎপরেই আমার মনে হইল যে আমি পলাইতেছি। ভাল করিয়া চক্ষু না মেলিয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম এটা কোন্ ষ্টেশন? একজন সহযাত্রী উত্তর করিলেন—মধুপুর।

মধুপুর! নামটা শুনিয়াই আমার ঘুমের ঘোর কাটিয়া গেল। এখানে আমার এক জাটতুতো ভগ্নী ও ভগ্নীপতী আছে। ভয় হইল কি জানি কোন সংবাদ পাইয়া যদি আমাকে ধরিয়া ফেলে? উঠিয়া বসিলাম। ভয়ে ভয়ে চক্ষু মেলিতে না মেলিতেই দেখি সতীশ গাড়ির ভিতর দাঁড়াইয়া আছে একটা কুলী আমার পোর্টমেণ্ট নামাইতেছে।

যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়! আমাকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়াই সতীশ বলিল—"কি হে ভায়া যে? এত ঠাণ্ডাতেও মাথা ঠাণ্ডা হয় নাই? এখনও রাগ আছে? নেমে পড় ভাই, নেমে পড়—দেরী কোরো না।"

তখন আমার পোর্টমেণ্ট নামিয়া গিয়াছে! যায় যাক্ আমি নামিব না। আমি যেন সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া শয়ন করিবার চেষ্টা করিলাম। কনুয়ের উপর ভর দিয়া অর্দ্ধশায়িত হইয়া বলিলাম—কেহে সতীশ! ভাল ত সব!

সতীশ বলিল—ভালমন্দর কথাগুলা প্ল্যাটফরমে হবে এখন! Like a good boy নেমে এস দেখি!

আমি তখনই বলিলাম—আমি যে কানপুর অবধি টিকিট নিয়েছি, বিশেষ আবশ্যক, এখানে নামলে ত চলবে না।

সতীশ বলিল—বিলক্ষণ চলবে হে! আবশ্যক আমি রেখে দাও—নেমে পড়তো ভাই দেরী করো না—ট্রেন ছেড়ে দেবে।

আমি সজোরে বলিলাম—আমি নামবো না, তুমি যাও।

গাড়ীতে কয়েকটি ভদ্রলোক ছিলেন;—সতীশ তাঁহাদের নিকট আমার পলায়ন বৃত্তান্তটা এমন করিয়া বলিল যে তাঁহাদের হাসি এবং অনুরোধে অস্থির হইয়া আমি অগত্যা গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম ড্রাইভারের সহিত সতীশের কোন যোগ ছিল কিনা বলিতে পারি না, সেও সেই মুহূর্ত্তে গাড়ী ছাড়িয়া দিল!

রাত্রির শেষভাগে খাটের উপর গরম বিছানায় শুইয়া বুঝিতে পারিলাম যে এই দুরন্ত শীতে গৃহত্যাগ সুখকর নহে। কিন্তু কাল কেমন করিয়া প্রভার সমক্ষে বাহির হইব সেই চিন্তায় ঘুম হইল না।

( ২ )

আমি পলাইয়াছি এ সংবাদ বাবা কেমন করিয়া জানিতে পারিয়া সঙ্গে সঙ্গে সতীশকে আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম করেন। পঞ্জাব মেল আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই সতীশ সেই টেলিগ্রাম পাইয়া কিরূপে আমাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া খাটে শোওয়াইয়া রাখিয়াছে—তাহা যে সেই রাত্রেই প্রভাকে বলিয়া দেয়। সব শুনিয়া প্রভা সেই রাত্রে আর আমাকে লজ্জা দিতে আসিল না। ভোরের সময় একটু ঘুমাইয়া পড়ি। যখন চক্ষু চাহিলাম তখন বেলা হইয়া গিয়াছে—বাহিরের পক্ষী কলরব শুনিতে পাইলাম। পাশ ফিরিয়া দেখি একটী বালিকা প্রভার

খোকাটীকে লইয়া শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে খোলা জানালা দিয়া নবীন সূর্য্যালোক আসিয়া তাহার উপর পড়িয়াছে—লাল রঙ্গের শাল এবং মেকণার জ্যাকেটের আভাটুকু তাহার মুখে অপরিসীম সৌন্দর্য্য করিয়া দিতেছে।

আমাকে জাগিতে দেখিয়া বালিকা খোকাকে বিছানার উপব বসাইয়া দিল এবং নম্রস্বরে বলিল—দিদি জিজ্ঞাসা কল্লেন—আপনার চা কি এইখানে এনে দেবেন?

আমি খোকাকে লইয়া আদব কবিতেছি এমন সময় প্রভা আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভা আমার দিদি—আমার অপেক্ষা মাস কতকের বড। এ কারণে কস্মিনকালেও আমি তাহাকে দিদি বলি নাই। বরাবর নাম ধরিয়াই ডাকি। আমাদের ভাই ভগ্নীর মধ্যে যেমন কোন সম্ভ্রম নাই, তেমনি কোন বিষয়ে সঙ্কোচের ছায়াটুকুও ছিল না। তবু আজ তাহাব সমক্ষে আমার বড় লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। আমি ভাল করিয়া মুখ তুলিতে পারিলাম না।

আমার যে বিবাহের ঠিকঠাক হইযাছে, তাহা প্রভা জানিত। এবং কি কারণে আমি বাটী হইতে পলাইযা আসিযাছি, তাহাও বুঝিতে তাহার বিলম্ব হয নাই। তবু সে কথার কোন উল্লেখ না করিযা প্রভা কহিল—কি মন্মথ কখন এলে? ভাল ত সব? আমি বলিলাম—রাত্রে এসেচি সব ভাল। কানপুর যাচ্ছিলাম—একবার খোকাকে দেখে যেতে ইচ্ছা হল।

প্রভা। তাই ধস্তাধস্তি করে গাড়ী হতে নামান যায় না—কানপুরে কি দরকার?

বিশেষ দরকার বলিয়া—আমি মুখ ধুইতে উঠিয়া গেলাম। বিশেষ দরকারটুকু সে কি, তাহা প্রভা ভালরূপ জানিত তাই সে আগে হইতেই আমার উপর এক চাল চালিয়া রাখিয়াছিল। আমি মুখ ধুইয়া আসিলে আবার সেই পূর্ব্ব দৃষ্ট বালিকাটী আমাকে চা আনিয়া দিল। আমি প্রভাকে জিজ্ঞাসা কবিলাম—"এ মেয়েটী কে?" প্রভা একটু হাসিয়া বলিল—এই দীননাথ বাবুর মেয়ে—পাশের বাড়ীতেই বাসা"। আমি সেই দিন কানপুব যাইব বলিয়া জেদ করিতে লাগিলাম, কিন্তু প্রভা বলিল—না মন্মথ, আজ পাথরোলের কালীবাড়ী থেকে প্রসাদ আসবে—আর আমাদের বাগানে কেমন পুদিনা হয়েছে—তাবই চাটনি করে তোমাকে খাওয়াব—আজ কিছুতেই তোমার যাওয়া হবে না। সুতরাং আমি সে দিনের জন্য তথায় থাকিতে বাধ্য হইলাম।

( ৩ )

প্রত্যহ পুদিনাব চাটনি এবং দধিচীর অনুকরণে একটী করিয়া ছাগশিশুব আত্মত্যাগ আমাকে কিযদ্দিন মধুপুরে আটকাইয়া রাখিল। আমি দিনকতক সতীশের বাইসিকল্ খানার যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিলাম—প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে অনেক দূর বেড়াইয়া আসিতে লাগিলাম। দিনগুলি বেশ নির্ব্বিবাদে কাটিতে লাগিল এবং আমার স্বাস্থ্যের অনেক পরিবর্ত্তন দেখা গেল। আমি কানপুরে যাইবার কথা ভুলিয়া গেলাম, এই সময় প্রভা আমাকে

জ্বালাতন করিয়া তুলিল—ঘুরিতে ফিরিতে আমি সেই বালিকাটীকে দেখিতে পাইতাম। প্রত্যহ প্রভাতে চা য়ের খবর লইতে মধ্যাহ্নে আহারের পর পানগুলি দিতে, বৈকালে জলখাবারের সংবাদ দিতে সে নিয়মিতরূপে আমার নিকটে আসিত। আমি বিশেষ লক্ষ্য করিয়াও তাহার মুখের ভাবের ঈষৎ বৈলক্ষণ্য খুঁজিয়া পাইলাম না। মেয়েটার চক্ষে কি গুণ আছে—তাহা ক্রমশঃ আমাকে মোহিত করিয়া তুলিল। তাহার সেই ঘন ঘন আবির্ভাবে, ব্রীড়াবনত অথচ উন্মুখ দৃষ্টিতে, তাহার অপরূপ রূপের মাধুরীতে আমার যে একটা অবস্থান্তর ঘটিতেছে, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম। তাহার মৃদুকণ্ঠস্বর ক্রমশঃ আমার নিকট মিষ্টতর বোধ হইতে লাগিল—তাহার অঙ্গসঞ্চারী বায়ুহিল্লোল আমার নাসারন্ধ্রে একটা নূতনতর দেলখোসের সৃষ্টি করিল। ক্রমশঃ এমনি হইল যে তাহার অনুপস্থিতিতে তাহারই চিন্তা আমাকে ছাড়িতে চাহে না—আমি মহা বিপদে পড়িলাম। সতীশ ও প্রভা চক্ষু মুদিয়া ছিল না—তাহারা কেবল মজা দেখিতেছিল। হয়ত একদিন মধ্যাহ্নে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিদ্রার ভাণ করিতেছি এমন সময় শুনিতে পাইলাম—যা না বাঁশী—মন্মথকে ডেকে নিয়ে আয় না—তাসখেলা করি। বাঁশী তখনই আসিয়া উপস্থিত! ময়নাপাখীটির মত বলিল—মন্মথবাবু—দিদি ডাকচেন—উঠুন না।

আমি হৃৎকম্প ধরিয়া একদৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়া আছি—কি উত্তর দিব ভাবিতেছি—এমন সময় একদিকের দরজার অন্তরাল হইতে উচ্চ কলহাস্য তাহাকে বিস্মিত এবং আমাকে অতিমাত্র লজ্জিত করিয়া দিল।

বাঁশীর পিতার নাম—দীননাথ বাবু। বাড়ীর পাশেই তাঁহার বাড়ী_ মধুপুরে বারমাসই থাকেন। আর দুই এক খানি বাড়ী আছে—ভাড়া চলে—তাহা হইতেই সংসারের ব্যয়নির্ব্বাহ হয়। তিনি নিজেও অল্পস্বল্প ডাক্তারি পড়িয়াছিলেন, এখন সে বিদ্যায় অধিক কিছু হয় বলিয়া বোধ হয় না ভদ্রলোকের একটি ছোট রকমের ডিসপেন্সারি আছে—সকালে বিকালে তিনি সেইখানেই বসিয়া থাকেন।

বাঁশী প্রায় অহরহ আমাদের বাড়ীতেই থাকে—একদিন প্রভা ধরিল—সকলের ফটোগ্রাফ তুলিতে হইবে। সতীশের একটা ক্যামেরা ছিল—পত্নীর মুখ হইতে কথাটা বাহির হইবামাত্র সে সেটাকে লইয়া গিয়া মহা আগ্রহের সহিত বাগানে বসাইল। অনুরোধের দায়ে যখন ফটো তোলাইতে গেলাম তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, অদূরে পানিয়াখোলার মহুয়া গাছগুলার মধ্যে সূর্য্য ডুবিয়া যাইতেছে। নিকটস্থ একটা লতাধারে অসংখ্য হাসনোহেনা ফুটিয়াছিল—তাহার ঘন সুগন্ধ সে স্থানটিকে সৌরভময় করিয়া রাখিয়াছে।

উপরের সিঁড়িতে তখনও অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের সোণালি কিরণরাশি জ্বলিতেছিল—

ফিরোজরঙের সাটী এবং স্বর্ণালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া যখন বাঁশী সেইখান দিয়া নামিয়া আসিল, তখন সেই নবযৌবন মুখরিত কিশোরীর রূপরাশি হইতে যে ছটা বিকীর্ণ হইতেছিল—তাহা যেমন নয়নরঞ্জন তেমনই প্রাণোন্মাদকারী। এবং তাহা ফটো-প্লেটে হউক বা না হউক আমার হৃদয়ে গাঢ়-তররূপে অঙ্কিত হইয়া গেল। আমার মন প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং প্রতি উষ্ণ নিশ্বাসের সহিত হৃদয়াভ্যন্তর হইতে কে যেন কাণের কাছে বলিতে লাগিল—"কেন তুমি মূর্ত্তি হয়ে এলে—রহিলে না ধ্যান ধারণায় ?"

সেই রাত্রে বিছানায় পড়িয়া ভাবিতে ভাবিতে আমি স্থির করিলাম—যেমন করিয়াই হউক—বাঁশীকে বিবাহ করিব ! কিন্তু উপযাজক হইয়া সে কথা পাড়িতে পারিলাম না—বড়ই লজ্জা বোধ হইল। সতীশ বা প্রভা কেহই কিছু বলে না, তাহারা মজা দেখিতেছে - তা বলিবে কি ? ক্রমশঃ আমার মনে প্রভার উপর বড় অভিমান জন্মিল—সে কেন কোন কথা তোলে না-সেই ত এই বিপত্তি ঘটাইল। অভিমানে দুঃখে মনে করিলাম যে বাঁশীর চিন্তা ত্যাগ করিব—তাহাকে ভুলিব। কিন্তু পরদিনই আবার তাহাকে দেখিবামাত্র সব সঙ্কল্প ওলটপালট হইয়া গেল, যে অহরহ চক্ষের সমক্ষে ঘুরিতেছে—তাহাকে কেমন করিয়া ভোলা যায়। তখন ঠিক করিলাম যে পলায়নই শ্রেয় তাহা হইলেই আর কেনে আপদ থাকিবে না।

( ৪ )

আমি বাটি হইতে পলায়ন করায় বাবাকে কিছু বিপদে পড়িতে হইয়াছিল কন্যাকর্ত্তার নিকট অপদস্থ হইবার আশঙ্কায় বিবাহের দিন পিছাইয়া দিয়াছিলেন! সকল কথাই আমি মধুপুরে থাকিয়া শুনিতে পাইতাম।

আমাকে ধরিয়া আনিয়া সতীশ বাবাকে লিখিয়াছিল—মন্মথ এইখানেই আছে-আছে ভাল। বিবাহের দিনটা কিছু পিছাইয়া দিলে ভাল হয়, তাহার কারণ অধিক পীড়াপীড়ি করিলে যদি সে আবার কোথায় চলিয়া যায়। বাবা সতীশের কথায় একেবারে ফাল্গুন মাসের শেষভাগে দিন স্থির করিয়া লিখিয়াছিলেন—তুমি তাহাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবে। আমি গেলেই ভাল হইত কিন্তু তুমিওত জান কলিকাতার বাহির হইলেই আমার পাকযন্ত্র অবাধ্য হইয়া উঠে।

মাসখানেক মধুপুরে কাটিল; দেখিতে দেখিতে ফাল্গুন মাস শেষ হইয়া আসিল। এই একমাস মধুপুরে কাটাইয়া আমার অদৃষ্টে যাহা ভোগ ছিল তাহাত হইল - এখন এমন এক স্থানে যাইতে হইবে যেখানে ইহার অবসান হইবে। এই স্থির করিয়া একদিন এরূপ প্রসন্ন ভাবে পোর্টম্যাণ্ট গুছাইয়া লইলাম যে সতীশ কিম্বা প্রভা ঘুণাক্ষরেও কিছুই জানিতে পারিল না। সঙ্কল্প করিলাম সেই রাত্রেই পলাইব।

সেদিন মধ্যাহ্নে সতীশের বাইসিকলখানা লইয়া বাহির হইয়া গেলাম। সন্ধ্যা হইয়া গেল তথাপি ফিরিলাম না। রাত্রি দুইটার সময় আমার ট্রেণ—এগারটার সময় বাসায়

আসিয়া পৌঁছিলাম। তখনই গন্ধক এবং আল্‌কাতরার গন্ধানুভব করিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে অমঙ্গলাশঙ্কা আমার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। এ ঘর ও ঘর খুজিয়া কোথাও প্রভা কিম্বা সতীশ কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। বেহারাটাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল—পাশের বাড়ীর বাবুর অসুখ হত্তয়াৎ বাবু আর মাইজি দুইজনেই সেইখানে গেছেন। সহসা আমার অন্তরাত্মা চমকিয়া উঠিল। পাশের বাড়ীতে অসুখ! কি অসুখ? বাঁশীর কিছু হয় নাই ত?

আমি তখনই সেই বাড়ীতে গেলাম। প্রথমেই সতীশের সহিত দেখা হইল। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার আগেই সে বলিল—তুমি আজ কোথায় ছিলে মন্মথ! দীনবাবুর বড় ব্যারাম—কলেরা হইয়াছে।

"কলেরা? সর্ব্বনাশ! কখন থেকে হল?"

"বেলা তিনটার পর থেকে—এস দেখবে এস।"

ঘরে ঢুকিয়াই দেখি হর্ম্মোপরি একটা সামান্য বিছানায় রোগী শায়িত। পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার পত্নী কাঁদিতেছেন—প্রভা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার প্রয়াস পাইতেছে। মাথার শিয়রে বসিয়া বাঁশী—বাবা বলিয়া ডাকিতেছে—কোন সাড়া শব্দ না পাইয়া সেও কাঁদিতেছে। আমাকে দেখিয়াই প্রভা বলিল—মন্মথ কোথায় ছিলি ভাই—ছাখ এদিকে কি বিপদ হয়েছে।

আমি সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া রোগীকে দেখিতে লাগিলাম। যাহা দেখিলাম—তাহাতে বড় ভয় হইল। রোগ তৃতীয় বা সাংঘাতিক অবস্থায় পরিণত হইয়াছে—সর্ব্বাঙ্গ শীতল, চোয়াল বদ্ধ হইয়া গিয়াছে—অচেতন অবস্থায় রোগী পড়িয়া আছে।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—কি দেখিলে? বাঁচিবে?

আমি। বলিতে পারি না—**He has come to the last stage**

সতীশ। তবে কি হইবে। অন্য কোন ডাক্তারও পাই না। তুমি কি চিকিৎসা করিতে পারিবে না?

আমি। চল দেখি ইহাঁর ডিসপেনসারিতে কি ওষুধ আছে।

সতীশের সঙ্গে তাড়াতাড়ি ডিসপেনসারিতে ঢুকিলাম, গোটাকত শিশি বাছিয়া লইয়া আবার আমার পোর্টম্যাণ্ট হইতে পকেট কেস আনিতে ছুটিলাম! পকেট কেস দেখিয়া সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—ওটা কি হইবে।

"ইনজেক্ট করিতে হইবে"

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—কেন?

রোগীর ত চোয়াল বদ্ধ—ঔষধ খাওয়াইবার উপায় নাই—কাজেই ইনজেকসন ছাড়া গত্যন্তর দেখি না।

যখন হাইপোডারমিক সিরিঞ্জটা রোগীর বাহুমূলে ফুঁড়িবার উদ্যোগ করিলাম—তখন বাঁশী আমার হাত চাপিয়া ধরিল—কাঁদিয়া বলিল—ওগো মন্মথবাবু—বাবাকে আমার মেরে ফেলো না—আমি তাহার হাত ছাড়িয়া ফেলিয়া দিলাম এবং রোগীকে চারি জায়গায় ইনজেকট করিলাম!

ইনজেকসনের পর সেলাই সমাধা করিয়া আমি বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। দারুণ শীতকালের রাত্রে গাছের পাত বাহিয়া টুপটাপ শব্দে শিশিরের ফোঁটা পড়িতেছে। আর সেইখানে অন্তরালে দাঁড়াইয়া মুখ লুকাইয়া বাঁশী কাঁদিতেছে।

আমি ডাকিলাম—বাঁশী, বাঁশী ফিরিয়া, দূর বনান্তের অন্তরালে ক্ষীণ পাণ্ডু-চন্দ্রলেখা অস্ত যাইতেছিল—তাহার সেই ম্লান জ্যোৎস্নারাশি আসিয়া কম্পিতাধরা বাঁশীর মুখের উপর পড়িল। সেই ভয়চকিত-উৎকণ্ঠিত মুখশ্রীতে আমি যে কি দেখিলাম, তা আজ আর আমার ভাল মনে হয় না, কিন্তু তখনি

আমার চিত্ত বেদনায়, দুঃখে এবং দারুণ মমতায় ভরিয়া গেল।

আমি কাতর স্বরে বলিলাম—ভয় নাই বাঁশী তোমার বাবা ভাল হবেন। বাঁশী কোন উত্তর না দিয়া শিশিরসিক্ত রেলিং ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তিন দিন মহিষবাহনের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিয়া বাঁশীর পিতাকে তাঁহার কবল হইতে ছিনাইয়া লইলাম—দীননাথবাবু সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। যেদিন তাঁহার পথ্যের ব্যবস্থা করিলাম, তাঁহার পত্নী আমাকে বলিলেন—বাবা আর জন্মে তুমি আমার কে ছিলে।

পাঁচবৎসর ধরিয়া যে মেডিকেল কলেজে মড়া ঘাঁটিয়া আসিতেছি,আজি তাহা সার্থক্য হইল। আমি মনে মনে বলিলাম—এজন্মে একটা কেহ হইবার আশা রাখি।

( ৫ )

লজ্জার মাথা খাইয়া বিবাহ প্রস্তাবটা আমাকে করিতে হইল না, সতীশ গোপনে গোপনে কেমন করিয়া তাহা করিয়াছিল—তাহা আমি জানিতে পারিবার আগেই এক দিন প্রাতঃকালে প্রভা আমাকে হলুদ মাখাইয়া দিল, তাহার পরে কোথা হইতে একটা পুরোহিত আসিয়া আমার পিতৃমাতৃকুলের তিনপুরুষের নাম সংযুক্ত করিয়া আমাকে কি কতকগুলা মন্ত্র পাড়াইল—আমি তাহার একবর্ণও বুঝিলাম না।

সেই রাত্রেই বাঁশীর সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেল। পরদিবস নববধূ লইয়া স্যাম্পেন গাড়ীখানায় উঠিলাম, তাহা সতীশের বাসায় না আসিয়া একেবারে ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। ওয়েটিংরুমে প্রভা কখন আসিয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই সে বাঁশীকে ডাকিয়া লইল। আমি পিছন ফিরিয়া দেখিলাম সতীশ টিকিট খরি-তেছে—সঙ্গে রাশিকৃত লগেজ লইয়া কুলীর পাল ধকাবকি করিতেছে।

বম্বেমেল হইতে যখন হাবড়ায় নামিলাম, তখনই বাড়ীতে পৌঁছিলে কি হইবে—এই আশঙ্কায় আমার হৃদয় দুরুদুরু করিতে লাগিল। কিন্তু যখন গাড়ীখানা বাড়ীর দরজায় গিয়া থামিল এবং মা আসিয়া নব-বধূকে কোলে করিলেন, তখন আমার হৃদয়ের ভার দূর হইয়া গেল। শঙ্খ এবং হুলুধ্বনির সহিত আমি বাটী প্রবেশ করিলাম।

বাবাকে গিয়া প্রণাম করিলে তিনি কেবলমাত্র আশীর্ব্বাদ করিলেন—"সুখী হও বুঝিলাম আটহাজার টাকার শোকে তিনি এখনও কাতর হইয়া রহিয়াছেন।

এই কাতরতা অধিক্ষণ ছিল না। যখন বারাণসী সাটি পরিহিতা বধূ কোলে লইয়া মা তাঁহার নিকট গেলেন এবং সোণালী আঁচলটি গলায় দিয়া যখন বধূটি তাঁহাকে প্রণাম করিল—তখন বাবা তাহাকে কোলে বসাইলেন! একদৃষ্টে তাহার মুখখানি দেখিতে লাগিলেন।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন—পেয়েছ আট হাজার টাকা? গম্ভীর প্রকৃতি বাবা হাসি।" বলিলেন—পেয়েছি।

ওই হাসির অর্থ কি,তাহা আমি আজিও বুঝিতে পারিলাম না।

শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়।

# সম্পাদকীয় মন্তব্য।

**পুরাতন আলোচনা।**—দশম বর্ষ হইতে সম্পূর্ণ আলোচনা কয়েক শেট মাত্র বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। স্বদেশী নেতাবর্গের সুন্দর সুন্দর হাপটোন ছবিযুক্ত; ছাপা অতি উৎকৃষ্ট এবং সুন্দর সুন্দর শ্রীপাঠ্য গল্প ও প্রবন্ধে সুশোভিত। প্রতি বর্ষের সম্পূর্ণ এক শেট ১৲ টাকার হিসাবে বিক্রয় হইতেছে; পুস্তক আর বেশী নাই; সত্বর হউন।

---

**নিবেদন।**—আমরা দ্বাদশ বর্ষের ৪খানি উপাদেয় উপহার যথা—তাপস-কুমার, লহরী, রমা, ও ঝঙ্কার, প্রায় ৬০০ শত পৃষ্ঠায় পূর্ণ। ভারত-পূজ্য, সুরেন্দ্র ব বু গুরুদাস বাবু, রাজা প্যারীমোহন প্রভৃতির দ্বারা বাহুল্যরূপে প্রশংসিত। আমরা সকলের নামে ভিঃ পিঃ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। যাহার আপত্তি থাকে, সত্বর জানাইবেন, নতুবা ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়া আমাদের ক্ষতি-গ্রস্ত করিবেন না।

---

**বিবাহ ও ঋতু-সংস্কার।**—শ্রীযুক্ত রাম-প্রাণ শর্ম্মা কবিরঞ্জন প্রণীত, পুস্তকখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে; ইহা বিবাহিতা স্ত্রী ও পুরুষ মাত্রেরই পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাতে সাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয় যথেষ্ট আছে। ঠাকুরমার মুষ্টিযোগ ও সমালোচা গ্রন্থখানি একত্রে লইলে সকলেই সডাক ৷৷০ আনায় পাইবেন। ঠিকানা—১০২ নং খুরুট রোড কুষ্ঠ-কুটীর—হাওড়া।

---

আসিয়া পৌঁছিলাম। তখনই গন্ধক এবং আলকাতরার গন্ধানুভব করিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে অমঙ্গলাশঙ্কা আমার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। এ ঘর ও ঘর খুঁজিয়া কোথাও প্রভা কিম্বা সতীশ কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। বেহারাটাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল—পাশের বাড়ীর বাবুর অসুখ হওয়ায় বাবু আর মাইজি দুইজনেই সেইখানে গেছেন। সহসা আমার অন্তরাত্মা চমকিয়া উঠিল। পাশের বাড়ীতে অসুখ! কি অসুখ? বাঁশীর কিছু হয় নাই ত?

আমি তখনই সেই বাড়ীতে গেলাম। প্রথমেই সতীশের সহিত দেখা হইল। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার আগেই সে বলিল—তুমি আজ কোথায় ছিলে মন্মথ! দীনবাবুর বড় ব্যারাম—কলেরা হইয়াছে।

"কলেরা? সর্ব্বনাশ! কখন থেকে হল?"

"বেলা তিনটার পর থেকে—এস দেখবে এস।"

ঘরে ঢুকিয়াই দেখি হর্ম্মোপরি একটা সামান্য বিছানায় রোগী শায়িত। পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার পত্নী কাঁদিতেছেন—প্রভা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার প্রয়াস পাইতেছে। মাথার শিয়রে বসিয়া বাঁশী—বাবা বলিয়া ডাকিতেছে—কোন সাড়া শব্দ না পাইয়া সেও কাঁদিতেছে। আমাকে দেখিয়াই প্রভা বলিল—মন্মথ কোথায় ছিলি ভাই-দ্যাখ এদিকে কি বিপদ হয়েছে।

আমি সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া রোগীকে দেখিতে লাগিলাম। যাহা দেখিলাম—তাহাতে বড় ভয় হইল। রোগ তৃতীয় বা সাংঘাতিক অবস্থায় পরিণত হইয়াছে—সর্ব্বাঙ্গ শীতল, চোয়াল বন্ধ হইয়া গিয়াছে—অচেতন অবস্থায় রোগী পড়িয়া আছে।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—কি দেখিলে? বাঁচিবে?

আমি। বলিতে পারি না—He has come to the last stage

সতীশ। তবে কি হইবে। অন্য কোন ডাক্তারও পাই না। তুমি কি চিকিৎসা করিতে পারিবে না?

আমি। চল দেখি ইহাঁর ডিসপেনসারিতে কি ঔষধ আছে।

সতীশের সঙ্গে তাড়াতাড়ি ডিসপেনসারিতে ঢুকিলাম, গোটাকত শিশি বাছিয়া লইয়া আবার আমার পোর্টম্যাণ্ট হইতে পকেট কেস আনিতে ছুটিলাম! পকেট কেস দেখিয়া সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—ওটা কি হইবে।

"ইনজেক্ট করিতে হইবে"

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—কেন?

রোগীর ত চোয়াল বন্ধ—ঔষধ খাওয়াইবার উপায় নাই—কাজেই ইনজেকসন ছাড়া গত্যন্তর দেখি না।

যখন হাইপোডারমিক সিরিঞ্জটা রোগীর বাহুমূলে ফুঁড়িবার উদ্যোগ করিলাম—তখন বাঁশী আমার হাত চাপিয়া ধরিল—কাঁদিয়া বলিল—ওগো মন্মথবাবু—বাবাকে আমার মেরে ফেলো না—আমি তাহার হাত ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলাম এবং রোগীকে চারি জায়গায় ইনজেকৃট করিলাম।

ইনজেকসনের পর সেলাই সমাধা করিয়া আমি বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। দারুণ শীতকালের রাত্রে গাছের পাত বাহিয়া টুপটাপ শব্দে শিশিরের ফোঁটা পড়িতেছে। আর সেইখানে অন্তরালে দাঁড়াইয়া মুখ লুকাইয়া বাঁশী কাঁদিতেছে।

আমি ডাকিলাম—বাঁশী, বাঁশী ফিরিল, দূর বনান্তের অন্তরালে ক্ষীণ পাণ্ডু-চন্দ্রলেখা অস্ত যাইতেছিল—তাহার সেই ম্লান জ্যোৎস্নারাশি আসিয়া কম্পিতাধরা বাঁশীর মুখের উপর পড়িল। সেই ভয়চকিত-উৎকণ্ঠিত মুখশ্রীতে আমি যে কি দেখিলাম, তা আজ আর আমার ভাল মনে হয় না, কিন্তু তখনি

আমার চিত্ত বেদনায়, দুঃখে এবং দারুণ মমতায় ভরিয়া গেল।

আমি কাতর স্বরে বলিলাম—ভয় নাই বাঁশী তোমার বাবা ভাল হবেন। বাঁশী কোন উত্তর না দিয়া শিশিরসিক্ত রেলিং ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তিন দিন মহিষবাহনের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিয়া বাঁশীর পিতাকে তাঁহার কবল হইতে ছিনাইয়া লইলাম—দীননাথবাবু সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। যেদিন তাঁহার পথ্যের ব্যবস্থা করিলাম, তাঁহার পত্নী আমাকে বলিলেন—বাবা আর জন্মে তুমি আমার কে ছিলে।

পাঁচবৎসর ধরিয়া যে মেডিকেল কলেজে মড়া ঘাঁটিয়া আসিতেছি,আজি তাহা সার্থক্য হইল। আমি মনে মনে বলিলাম—এজন্মে একটা কেহ হইবার আশা রাখি।

---

( ৫ )

লজ্জার মাথা খাইয়া বিবাহ প্রস্তাবটা আমাকে করিতে হইল না, সতীশ গোপনে গোপনে কেমন করিয়া তাহা করিয়াছিল—তাহা আমি জানিতে পারিবার আগেই এক দিন প্রাতঃকালে প্রভা আমাকে হলুদ মাথাইয়া দিল, তাহার পরে কোথা হইতে একটা পুরোহিত আসিয়া আমার পিতৃমাতৃকুলের তিনপুরুষের নাম সংযুক্ত করিয়া আমাকে কি কতকগুলা মন্ত্র পাড়াইল—আমি তাহার একবর্ণও বুঝিলাম না।

সেই রাত্রেই বাঁশীর সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেল। পরদিবস নববধু লইয়া স্যাম্পেন গাড়ীখানায় উঠিলাম, তাহা সতীশের বাসায় না আসিয়া একেবারে ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। ওয়েটিংরুমে প্রভা কখন আসিয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই সে বাঁশীকে ডাকিয়া লইল। আমি পিছন ফিরিয়া দেখিলাম সতীশ টিকিট গণিতেছে—সঙ্গে রাশিকৃত লগেজ লইয়া কুলীর পাল বকাবকি করিতেছে।

বম্বেমেল হইতে যখন হাবড়ায় নামিলাম, তখনই বাড়ীতে পৌঁছিলে কি হইবে—এই আশঙ্কায় আমার হৃদয় দুরুদুরু করিতে লাগিল। কিন্তু যখন গাড়ীখানা বাড়ীর দরজায় গিয়া থামিল এবং মা আসিয়া নববধুকে কোলে করিলেন, তখন আমার হৃদয়ের ভার দূর হইয়া গেল। শঙ্খ এবং হুলুধ্বনির সহিত আমি বাটী প্রবেশ করিলাম।

বাবাকে গিয়া প্রণাম করিলে তিনি কেবলমাত্র আশীর্ব্বাদ করিলেন—"সুখী হও বুঝিলাম আটহাজার টাকার শোকে তিনি এখনও কাতর হইয়া রহিয়াছেন।

এই কাতরতা অধিক্ষণ ছিল না। যখন বারাণসী সাটি পরিহিতা বধু কোলে লইয়া মা তাঁহার নিকট গেলেন এবং সোণালী আঁচলটি গলায় দিয়া যখন বধুটি তাঁহাকে প্রণাম করিল—তখন বাবা তাহাকে কোলে বসাইলেন! একদৃষ্টে তাহার মুখখানি দেখিতে লাগিলেন।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন—পেয়েছ আট হাজার টাকা? গম্ভীর প্রকৃতি বাবা হাসি।" বলিলেন—পেয়েছি।

ওই হাসির অর্থ কি,তাহা আমি আজিও বুঝিতে পারিলাম না।

শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়।

---

# সম্পাদকীয় মন্তব্য।

বিজয়া সম্ভাষণ— সম্বৎসর পরে বিজয়ার শুভ বাসরে আমরা "আলোচনার" গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক ও পৃষ্ঠপোষক বর্গকে যথাযোগ্য আলিঙ্গন, নমস্কার ও আশীর্ব্বাদ করিয়া পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম, মা মহামায়া আমাদের দুর্ব্বল হৃদয়ে বল প্রয়োগ করুন, আমরা যেন তাঁহার শ্রীপাদ পদ্মে মতি রাখিয়া স্বদেশের ও স্বজাতির কার্য্যে প্রাণপাত করিতে পারি। দেশের এই দারুণ দুর্দ্দিনে, এই জীবন-সংগ্রামে মা বিশ্বেশ্বরীর কৃপা ব্যতীত আমাদের আর বিজয় লাভের আশা কোথায়?

—•—

নিবেদন—আমরা এখনও অনেক গ্রাহকের নিকট হইতে "আলোচনার" বার্ষিক মূল্য প্রাপ্ত হই নাই। বহু নূতন গ্রাহককে ইহার নমুনা পাঠান হইয়াছে। আমাদের চারিখানি উপাদেয় উপহার পুস্তক আর বেশী নাই। যাহাদের নিকট এখন মূল্য বাকী আছে এবং যাহারা নমুনা গ্রহণ করিয়া গ্রাহক হইবার আশ্বাস দিয়াছেন, স্বদেশবাসীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা যাহাদের ইচ্ছা তাহারা সত্বর পত্র লিখুন, নতুবা আমরা সকলের নামে ক্রমশঃ ভিঃ পিঃতে উপহার পাঠাইব। ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া কেহ যেন আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত না করেন ইহাই সানুনয় নিবেদন।

—•—

কংগ্রেস কথা—এবার আবার মান্দ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবার কথা হইতেছে কিন্তু এখন হইতেই গোলযোগ হইবার সূচনা হইতেছে। বোম্বাইয়ের চরম পন্থীরা তথায় যোগদান না করিয়া হয় মান্দ্রাজেই না হয় নাগপুরে স্বতন্ত্র বৈটক বসাইয়া কংগ্রেসের কার্য্য সমাধা করিবেন—এইরূপ কল্পনা হইতেছে। দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে দেশের এরূপ একটা মহৎ কার্য্যে প্রতি বৎসর নেতৃবর্গের মধ্যে মতভেদ লইয়া দেশের সর্ব্বনাশ করা এবং শত্রুপক্ষের হাস্যের পথ পরিষ্কার করা কোন ক্রমেই উচিত নয়। উভয় দলের নেতৃবর্গ সকলেই সুশিক্ষিত ও জননীর কৃতী সন্তান; দেশের মঙ্গলোদ্দেশে কার্য্য করিতে গিয়া নিরন্তর এরূপ মনোমালিন্য কখনই মঙ্গলজনক নহে। আমাদের মতে সকলে একত্র মিলিত হইয়া সামঞ্জস্য ভাবে কার্য্য করিলে সুফল লাভের সম্ভাবনা, নতুবা বৃথা লোক হাসাইয়া ফল কি?

দায়রাসোপর্দ্দ—বোমার মামলার অভিযুক্ত আসামীগণের মধ্যে প্রথম দলকে আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্লি দায়রা-সোপর্দ্দ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষকে কতকগুলি সংগৃহীত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ঐ সঙ্গে দায়রায় সমর্পন করা হইয়াছে।

—০—

দুর্ভিক্ষ—চারি দিকেই আহার্য্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে, কর্ত্তারা বলিতেছেন এ বৎসরের মত দুর্ভিক্ষের পরমায়ু শেষ হইয়াছে। হৈমন্তিক শস্যের অবস্থা এবার অতীব আশাপ্রদ, দেবী এবার গজে গমন করিয়াছেন—বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা হইবার কথা। জননীর কৃপা হইলে সকলই সম্ভব।

—০—

# রাখী।

নব-জীবনের পুণ্য শারদ প্রভাতে,
যুক্ত বাঙ্গালার যত ভাই ও ভগিনী,
সম্মিলিত হ'য়েছিল যেদিন সভাতে
আজি সেই শুভ দিন—রাখী-সম্মিলনী।
হাতে হাতে বাঁধা তাই প্রীতি-চিহ্ন রাখী—
একতা নিশান; নহে সূতার বন্ধন
প্রাণের বন্ধন বটে। মেলিয়াছে আঁখি,
ভাঙ্গিয়াছে বাঙ্গালীর মোহের স্বপন।
জাতি ধর্ম্ম ভুলি সবে হ'য়ে এক প্রাণ,
মিলেছে সন্তান জন্মভূমির আহ্বানে;
পেয়েছে নূতন শিক্ষা স্বদেশ কল্যাণ
নহে বাক্যবাণে কিন্তু একতা বন্ধনে;
মুক্তি-সাধনার একতাই এক তন্ত্র,
"বন্দে মাতরম্" সে তন্ত্রের মূলমন্ত্র।

শ্রীমাখম লাল গঙ্গোপাধ্যায়।

—০—

# ঈশ্বর অনুভূতি।

এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ-কর্ত্তার অত্যাশ্চর্য্য শিল্প-চাতুর্য্য পরিচিন্তন সময়ে, অনেকেই মনে মনে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, ভগবান তাঁহার সৃষ্ট জীবজন্তুর তত্ত্বাবধানে উদাসীন কি ব্রতী? তিনি কি প্রকৃতই প্রেমময় না নির্ম্মমতার আধার। বিশেষতঃ কোন লোক যখন দুরাবস্থার নিষ্পেসনে নিপীড়িত হইযা জল-বুদ্বুদের ন্যায় চঞ্চল আশার অন্তর্দ্ধানে হতাশ হইয়া—ন্যায়ের বিচার-লাভ করিতে না পারিয়া—মর্ম্মান্তিক ক্লিষ্ট হযেন, তখন তিনি নিতান্ত সংক্ষোভিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করেন যে, জগদীশ্বর সম্ভবতঃ তাঁহার ক্ষুদ্র ও স্বল্পশক্তি-সম্পন্ন জীব-মাত্রকেই ঘৃণা করেন ও তাহাদের প্রতি নৈষ্ঠুর্য্যে আনন্দিত হইয়া থাকেন। যাহারা ভগবানের উপর এইরূপ ভিত্তিহীন দোষারোপ করিতে প্রবৃত্ত, তাহারা যে নিতান্ত অসার ও ভক্তি-বিহীন লোক এরূপ বলিলেও অনেক সময় ন্যায়ের অসম্মান করা হয়।

উহারা ভগবানকে নির্দ্দয় সংজ্ঞা প্রদান করিয়া কোন কোন সময় পরিতৃপ্ত থাকিতে চাহেন বটে, কিন্তু আমরা যখনই—সেই সময়-টুকুর সঙ্গে তাহাদের মনের গতি সমালোচনা করি, তখনই জ্ঞাত হই যে শিক্ষার অপরিপক্কতার জন্যই উহারা যতদূর পরমেশ্বরকে গালি দিতে যত্নবান, ততদূর চিন্তা করিয়া তাঁহাকে দোষমুক্ত করিতে ইচ্ছা পরবশ নহেন। যাহারা দোষালোচনায় সময় কাটাইতে অভিলাষী, তাহারা গুণের আদর জানিবে কিরূপে? প্রতিবিম্ব গ্রহণে স্বচ্ছ মণি যেরূপ সমর্থ, মৃত্তিকা স্তূপ কি তদ্রূপ সমর্থ হইতে পারে? আমাদের সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করার যতগুলি বিঘ্ন আছে, তন্মধ্যে জন্মান্তর অবিশ্বাস ও তাঁহাকে পরীক্ষা করার প্রবৃত্তি প্রভৃতি প্রধানতম বিঘ্ন। ব্রহ্ম-পরায়ণ ভিন্ন কেহ কোন কালে ইহজীবনের কার্য্যদ্বারা—ভগবানের বিচার রহস্য উপলব্ধি করিতে পারেন বলিযা মনে হয় না।

বরং ইহজীবনের কার্য্যদ্বারা ভগবানের বিচার সমালোচনা করিতে গিয়া অনেকে হঠাৎ বিপথগামী হইয়া থাকেন। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইযা মানব ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক তাপ, দুঃখ, কষ্ট অনুভব করিতে অভ্যস্ত হয, তালবৃক্ষ পরিমাণিত দুঃখের অগণিত তরঙ্গ কোন না কোন লোকের হৃদয়-সাগরে সময়-বিশেষে তরঙ্গায়িত হয়। অভাব অভি-যোগ দুর্ঘটনা, প্রতারণা, বিরহ, চির বিচ্ছেদ-জনিত অসহনীয ক্লেশ কোন না কোন লোককে বিপদার্ণবে ভাসায়, কই সকলে ত একই রকম হর্ষ ও দুঃখের ভার তুল্য ভাবে ধারণ করিতে পারক নহে। তুমি যে দুঃখের কঠোর স্পর্শ চন্দন-প্রলেপিত কুসুম-বাস-বিকীরক-সমীরণ-শীতল বোধ করিবে, আমি সেই স্পর্শ বজ্রতুল্য কঠোর মনে করিয়া অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিব, তুমি প্রাণ-দণ্ডের আদেশ শ্রবণ করিয়া সহর্ষবদনে সকলের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না, আমি তৎশ্রবণে বিগত চেতন হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইব। তুমি শোণিত-তুল্য প্রিয়-পুত্রের বিয়োগ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাপিত হওয়া দূরে থাকুক, দ্বিগুণ উৎসাহে ভগবানকে ভক্তি করিতে অগ্রসর

হইবে, আমি সেইরূপ বিপদে অধীর হইয়া মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন করতঃ তাঁহার বিচারে দোষারোপ করিতে অনুমাত্র সঙ্কুচিত হইব না। হয়ত কোন সময় তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস হীন বা তাঁহাকে নির্দ্দয় আখ্যা প্রদান করিতে সাহসী হইব। একই শ্রেণীর বিপদাগমে একই প্রকার লোকের মতি দুইদিকে ধাবিত হয় কেন? তোমার অপেক্ষা আমি কম ভক্ত বা শিক্ষিত বলিয়াই কি তোমার ও আমার নিকট সুখ দুঃখের স্পর্শ তুল্য বোধক নহে? যদি আমি তোমারই ন্যায় বিদ্যা বিভব-গুণ-ভূষিত,সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়-কারণ-পদ-সেবিত,সুখ-দুঃখ-মায়া-মোহ-কারণাভিজ্ঞ হই, আর তোমার ন্যায় জন্মান্তরে বিশ্বাসী না হই, তাহা হইলে বিশ্ব নিয়ন্তার দুর্জ্ঞেয় বিচার ফলে তুমি যে দুঃখের আগমন মর্ম্মগ্রন্থিচ্ছেদী বোধ করিয়াও বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হইবে না, আমি তাহারই করাল ছায়া অবলোকন করিয়া সময় বিশেষে তাঁহাকে নিষ্ঠুর সংজ্ঞা প্রদান করিব, অথবা তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস হীন হইব। সাধু চরিত্র পরীক্ষা করিয়া দেখ—অনেক ধার্ম্মিক জন্মান্তর বিশ্বাস না করিয়া ইহ জীবনের কর্ম্মফল দ্বারা ভগবানের বিচার বিশ্লেষণ করিতে গিয়া মনুষ্যত্ব হারাইতেছেন।

অতএব ইহ জীবনের কর্ম্মফল দ্বারাই যাহারা ভগবানের বিচার সমালোচনা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন হইলেও বড়ই সঙ্কটাপন্ন স্থলে দণ্ডায়মান। যদি কোন সময় ইহ জীবনের কর্ম্মফলানুযায়ী অদৃষ্ট গঠিত হইতে না দেখেন, তাহা হইলে তাহারা সাধন পথ ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন ও ভগবানের বিচার-রহস্যদ্বার উদ্ঘাটিত করিতে না পারিয়া তাঁহারা তাঁহাকে নিষ্ঠুর অথবা সৃষ্টজীব সম্বন্ধে উদাসীন বলিয়া বর্ণনা করিতে পারেন। ইহাদিগের পতন চিন্তা করিলে হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হয়। ইহা দ্বারাই অনুধাবন করা যাইতেছে যে ঈশ্বর অনুভূতির জন্য ঈশ্বরকে পরীক্ষা করিতে চেষ্টা না করিয়া জন্মান্তর বিশ্বাস করা অন্ততঃ সাধকের প্রথম অবস্থায় নিতান্ত আবশ্যক।

আর একটি অন্তরায়—জড়বাদ। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ভগবান পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া ইহা চালাইবার জন্য একটা যন্ত্র বা Machine জুড়িয়া দিয়াছেন। Machine এর সাহায্যেই পৃথিবী অপ্রতিহতভাবে চলিতেছে। ভগবান আর Machine এক নহে, সুতরাং জাগতিক ঘটনার সংস্রবে ভগবান না থাকায় মনুষ্যের প্রতি তিনি কৃপাময় নহেন। বলা বাহুল্য যে বিজ্ঞান বিদ পণ্ডিতগণের মত ইহা হইতে স্বতন্ত্র নহে। তাহারা যতই শিক্ষার পথে অগ্রসর হইয়া নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছেন, ততই তাহারা এই তত্ত্বে পহুঁছিতেছেন যে, পৃথিবীর সমস্ত অংশই কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট ও অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম দ্বারা বিধৃত, চালিত, ও সুশাসিত। এই নিয়মগুলি পরস্পরের সঙ্গে এতই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত যে, একটির শক্তি অপরটির সাহায্য ভিন্ন প্রকাশিত হয় না। যে প্রকার একটি সময় রক্ষক ঘড়ি কতকগুলি Spring এর শক্তিতে কার্য্য করে, ঐ ঘড়ির একটি Spring খুলিয়া ফেলিলে ঘড়ি যেমন আর

নিয়মিত রূপ পরিচালিত হইয়া সময় রক্ষা করিবে না—বন্ধ হইয়া যাইবে। তদ্রূপ এই পৃথিবী চালিত হইবার জন্ত যে সব নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছে, কোনটিব যদি ব্যত্যয় হয়, তাহা হইলে ঘড়িটির স্তায় পৃথিবী বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে। ঘড়ির সাহায্যে আমরা যেরূপ সময় নিরূপণ করিয়া লই, তদ্রূপ জ্যোতির্ব্বিদগণ গ্রহাদির আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন দ্বারা জগতের গতি স্থির করিয়া লইয়া থাকেন। এই প্রাকৃতিক নিয়ম অপরিত্যজ্য ও অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়াই Astronomer গণ গ্রহগণেব ভ্রমণ স্থান পূর্ব্বেই স্থির কবিযা দিতে সমর্থ। রসায়ণবিদ্ পণ্ডিতগণ প্রকৃতিব অপরিত্যজ্য ধর্ম্মবলে কোন দ্রব্যের সঙ্গে কোন দ্রব্য সংমিশ্রণ কবিলে কি দ্রব্য উৎপাদিত হইবে বলিযা দিতে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ। প্রাকৃতিক নিয়ম যখন এইরূপ কখনই ভঙ্গ বা সীমাতিক্রম কবে না, তখন ইহাব নিকট ব্যক্তি বিশেষের আনুকূল্য বা অনুগ্রহ লাভ উহারা দুরাশা মনে করেন। উহাবা বলিযা থাকেন বিষ যদ্রূপ ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিকেব নিকট তুল্য শক্তি প্রকাশ করে তদ্রূপ স্বাভাবিক শক্তিও দস্যু এবং ন্যায়পবায়ণ লোকেব উপর সমান আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে। বাস্তবিক এ কথা শ্রবণ কবিলে ভগবানের অস্তিত্বে অবিশ্বাস বা তাঁহাকে নির্দ্দয় বলিতে প্রবৃত্তি জন্মে বই কি ?

স্বীকার করিলাম—এই প্রকৃতি কোন অপ্রতিহত নিয়মবলে চালিত হইতেছে। কিন্তু এ অভ্রান্ত নিয়ম কে প্রবর্ত্তিত করিল ? বিজ্ঞানবিদেরা প্রাকৃতিক নিয়মকে Laws of nature বলিয়া থাকেন। কোন নিয়ম কি আপনা হইতে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে ? একজন লোকের যদি কোন অপরাধের জন্ত ফাঁসির আদেশ হয়, তাহা হইলেই কি নিয়মটি বা আদেশটি তাহাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইতে পাবে ? কখনও না। কাহাকেও ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইতে হইলে রাজার আদেশ চাই, ফাঁসিকাষ্ঠ চাই, অপরাধী লোক চাই এবং অপবাধীকে আইন বা নিযমের অনুবর্ত্তী করাব জন্য আজ্ঞাবাহক চাই। ব্যক্তিবর্গ নিযমটিকে কার্য্যে পরিণত না করিলে নিযমের এমন শক্তি নাই যে সে কাহাকেও ধরিয়া বান্ধিযা তাহাব অনুগামী করিতে পাবে। প্রকৃতিব নিযমও সেইরূপ, কেহ তাহাকে প্রবর্ত্তিত না কবিলে তাহার সাধ্য কি যে, সে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চালিত কবে ? অতএব কেবল নিয়ম থাকিলেই কার্য্যটি সম্পন্ন হয না, নিযমানুযায়ী চালাইবার জন্য কাহাকেও নিযুক্ত হইতে হয, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চালাইবার জন্য অবশ্য একজন নিযুক্ত রহিয়াছেন—তিনি কে ? ইহাই আলোচ্য। জড়বাদীবা বলেন—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আব্রহ্ম কাল হইতে চলিতেছে, অবিশ্রান্তভাবে,অপ্রতিহত গতিতে, অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে চলিতেছে, যদি প্রকৃতি ভিন্ন অন্য কেহ থাকেন—তাহা হইলে কি কোন সময় তাঁহাকে নিয়মাদির বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হয় না ? গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসিতেছে, সূর্য্যাস্তের পর চন্দ্র উদিত হইতেছে, বাল্যকালের পর কৌমার আসিতেছে, এসব নিয়মের যদি কিছু কোন সময় ব্যতিক্রম দেখিতাম, তাহা হইলে

বরং ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতাম। একথা খাটিবে কেবল মনুষ্যের নিকট কারণ তাহাদের ইচ্ছা পরিবর্ত্তনশীল। তাহারা একটা কার্য্য করার প্রণালী স্থির করিয়া দুই ঘণ্টা পরে আবার তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া লয়। মনুষ্যের সামান্য ইচ্ছা পরিবর্ত্তনীয় বটে কিন্তু ভগবান যে ইচ্ছাবলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চালাইতেছেন সেই মহদিচ্ছা যে কোন সময়ের জন্য পরিবর্ত্তিত হইবে ইহাকি যুক্তি মূলক কথা ?

প্রথমে দেখিতে হইবে মনুষ্য কোন সময় কোন অবস্থায় ইচ্ছার পরিবর্ত্তন করিয়া লয়। যে সময়ে সে কার্য্য চালাইবার প্রণালী স্থির করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে বাধা প্রাপ্ত হয়। অতএব ইচ্ছার এই পরিবর্ত্তনটা মূর্খতা বা অবিজ্ঞতার জন্যই উদ্ভূত। যদি ইচ্ছাটা অবিজ্ঞতার জন্য পরিবর্ত্তনীয় না হইত তাহা হইলে বিজ্ঞ লোকের ইচ্ছাটা ঘণ্টায় ঘণ্টায় মূর্খের মত পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে দেখিতাম। একজন বিজ্ঞ লোক কোন একটী ষ্টেট চালাইবার জন্য যদি নিযুক্ত হয়েন, তাহা হইলে তাহার সংস্থাপিত নিয়মগুলি যত কার্য্যকারী ও স্থায়ী হইবে, একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিয়মগুলি সেইরূপ কার্য্যকারী ও স্থায়ী হইতে পারে না। একজন মূর্খের প্রবর্ত্তিত নিয়ম যদি এক বৎসর স্থায়ী রাখার যোগ্য হয়, তাহা হইলে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির নিয়ম শত বৎসর স্থায়ী করার আশা করা যাইতে পারে। ক্রমশঃ

সহ-সম্পাদক।

# নিদ্রা।

তুমি মা জগৎ-ধাত্রী
সংসার পালন কর্ত্রী
স্নেহময়ী বেশে ,
পুণ্য অমৃতের ভূমি
স্বরগের দেবী তুমি
মানবের দেশে। ১।
কেহ কোথা নাহি যার
তুমি তবু আছ তার
জুড়াতে পরাণ,
তাই মা তোমার নাম
আনন্দ শান্তির ধাম—
বিধাতার দান। ২।
কি ঘরে কি বনে যাও
যেথায় যাহারে পাও
করিয়া যতন,
স্নেহ কর বুলাইয়া
তাপজ্বালা ভুলাইয়া
কর অচেতন। ৩।
সুখ শয্যা নাহি চাও
ভ্রান্ত ক্লান্ত যারে পাও
বুকে তুলি লও ;
স্নেহ ঢালি অমৃতের
কত শত তাপিতের
পরাণ জুড়াও। ৪
নাহি চাও ধনমান
নাহি ভাব কুসন্তান

স্নেহ প্রেম ঢালি ;
কে কোথায় অনাহারে
কাঁদিছে ধুলায় পড়ে
তারে লও তুলি । ৫ ।
হেন শোক-দুঃখ-ভার
ঘুচাইতে কোথা আর
শান্তি নিকেতন ?
সুখী দুঃখী ধনী দীন
অভাগা আলয় হীন
ভুলাভাবে কেআর এমন । ৬ ।
এ ধরার যে তোমার
করুণা বঞ্চিত, তার
বিফল জীবন ;
পাপ তাপ জ্বালা তারে
সদাই জ্বালিয়ে মারে
হা দুর্ভাগা জন । ৭ ।
অভাগিনী আমি দীন
পাপে রত চিরদিন
কি জানি মহিমা,
তোমার করুণাস্নেহ
বচনে প্রকাশি কেহ
দিতে নারে সীমা । ৮ ।

কিন্তু মা,

এযে বড় ব্যথা মনে
সুখ শান্তি যেই দিনে
ভুল্লাল আমার,
সে ঘোর রজনী যোগে
কি ঘুম ভাঙ্গিল চোকে
কুহক তোমার । ৯ ।
সেই যে মরার মত
রেখেছিলে করি হত
কেন তবে আর,
কেন মা এ দুঃখিনীরে
ভাসাতে নয়ন নীরে
জাগালে আবার । ১০ ।
অয়ি নিদ্রে স্নেহময়ি,
হে সতি, জননি অয়ি
ও চরণে ধরি,
অগতির গতি তুমি
ও চরণ ধূলি চুমি
এ মিনতি করি । ১১ ।
সেই কুম্ভকর্ণ সম
একাল বিষম ঘুম
দিও না কাহারে,
সে ঘুম ঘুচিয়া ধরা
ভাসাবে পাগল পারা
শোক-সিন্ধু-নীরে । ১২ ।
মরম বন্ধন ছিঁড়ি
বেদনায় বুক চিরি
(যবে) চোরে লয় নিধি ;
তখন গো যেন তারে
শেষ দেখা দেখাবারে
কবে দিও বিধি । ১৩ ।
শুন মা শুন মা সতি
অভাগীর এ মিনতি
তোমার চরণে ;
নিয়ে চল প্রভু কাছে
কি আর আমার আছে
সে নিধি বিহনে ?

শ্রীমতী সরোজিনি সেন গুপ্তা ।

# স্মৃতির খেলা।

তুই যদি চলে গেলি ফেলে রেখে মোরে,
স্মৃতি টুকু কেন নাহি নিয়ে গেলি মুছে ;
একা আমি শূন্য হৃদে খুঁজে মরি তোরে,
প্রাণ শুধু কেঁদে ফিরে বুঝেও না বুঝে।
দুর্ব্বল আমারে পেয়ে স্মৃতি টুকু তোর,
বিশাল দৈত্যের মত বাড়ায়ে শরীর,
আমারে ঘিরেছে দেখ, করে কত জোর,
পিছু পিছু তাড়া করে, হতে নারি স্থির।
সদাই অলক্ষ্যে প্রাণ তোরি পানে ছুটে,
পান্থখানি চলে যায় অজ্ঞাতে আমার
তোরি খোঁজে ,—হায় শেষে যায় মোহ টুটে ;
'নাই'—'নাই'—ফিরে প্রাণ করে হাহাকার।
বাতাসে বহিয়া আনে তোরি কণ্ঠস্বর।
মানস নয়নে ভাসে তোরি মুখ ছবি।
তোরি স্পর্শ, তোরি স্নেহ, করে যে কাতর,
নিরাশ পরাণ মোর হারাইয়া সবি।
অকালে হারায়ে যায়, চক্ষু মুদি পাই,
ধরিতে মিশায়ে যায় বাতাসে আবার।
একি লীলা লীলাময়ি, তুই যদি নাই,
তবে কেন তো'তে ভরা হৃদয় আমার ?

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ।

---

# হত্যা-বৈচিত্র।

( ১ )

রাসায়নিক পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, বিজ্ঞান জগতে প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন অপেক্ষা রাসায়নিক পরিবর্ত্তন খুব শীঘ্র সম্ভব, আর উহাই সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন। প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন সময়সাপেক্ষ ; অপিচ উহার সম্পূর্ণ বিকাশ দেখা যায় না—কথাটী বিজ্ঞান-জগতে বলবৎ হইলেও মনুষ্য প্রকৃতিতে কতদূর প্রযোজ্য তাহা বলা দুষ্কর। উদাহরণ স্বরূপ রাসায়নিক পণ্ডিতেরা বলেন,—"সামান্য কাশীর চিনি ও ক্লরেট-অব পটাস একত্র মিশ্রিত করিলে উহাদের মিলনফলে একটী শ্বেত-শুভ্র আস্বাদ-বিহীন সুমিষ্ট চূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়—উহা চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক কখন কখন গল-ক্ষত (Sore-throat) নামক রোগে ব্যবস্থিত হইয়া সুফল উৎপাদন করে, কিন্তু একটি কাচনির্ম্মিত দণ্ড যদি গন্ধক দ্রব্যের ( Acidsulphuric ) ডুবাইয়া এই মিশ্রিত চূর্ণে স্পর্শ করান যায় তবে ঐ সংযোজনের কালে প্রলয়াগ্নির ন্যায় এক ভীষণ অগ্নি উৎপন্ন হইয়া ঐ চূর্ণকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নিময় গোলকে পরিণত করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করে ঐ স্থান দুর্গন্ধি-ঘন-ধূম্র রাশিতে পরিপূর্ণ হয়—এই উদাহরণটি কিন্তু মনুষ্য চরিত্রে সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায়, এমন দেখা গিয়াছে—যে অতি নির্ব্বিরোধী নিরীহ ব্যক্তিও ঘটনা-বৈচিত্রে উত্তেজিত হইয়া নর-হত্যা প্রভৃতি নিষ্ঠুর করি-

য়াছে। আমরা উপস্থিত এইরূপ একটির কথা বলিব বলিয়াই এত নিঃসম্পর্কীয় প্রথার অবতারণা করিতে বাধ্য হইলাম।

বোম্বাই সহরে হীরাচাঁদ মাণিকচাঁদের ঘড়ির দোকান বড়প্রসিদ্ধ। উহাঁদের পসার হইবার প্রধান কারণ উহাদের অসাধারণ সততা। এই দোকানের মালিকদ্বয় সাহেব দোকানদারদিগের ন্যায় কথারক্ষা করিতেন; কোন কার্য্য গ্রহণ করিয়া বাঙালী দোকানদারের ন্যায় খরিদদারদের হাঁটাহাঁটী করাইতে ইহাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন না; অধিকন্তু ইহাঁরা অন্য ব্যবসায়ীগণ অপেক্ষা অল্প লাভে কার্য্য করিতেন; এতদ্ভিন্ন দোকানের অন্যতম সত্বাধিকারী মানিকচাঁদ বড় কর্ম্মকুশল শিল্পী ছিলেন। শুনা যায়—তাঁহার হাতের মেরামত করা ঘড়ি অন্ততঃ দশ বৎসর বিনা ওজরে ঠিক খাঁটী সময় দিত। হীরাচাঁদ মাণিক-চাঁদ সম্পর্কে দুই ভাই--শুনা যায় অনেকদিন পূর্ব্বে দুর্ভিক্ষ পীড়িত হীরাচাঁদ কনিষ্ঠের হাত ধরিয়া রাজপুতানার দুস্তর মরুভূমি পার হইয়া বোম্বাই সহরে আসেন—পরে কি জানি কোন ভাগ্যফলে তিনি আজ কমলার বরপুত্র, অতুল ধনের ঈশ্বর—এখন আর তিনি নিজে কোন কাজকর্ম্ম করেন না—কনিষ্ঠ মানিকচাঁদই সব দেখেন শুনেন; আর জ্যেষ্ঠ হীরাচাঁদ সমস্ত তত্বাবধান করেন,ক্রেতাদের মধুর বাক্যে আপ্যায়িত করেন আর অবসর পাইলে প্রদর্শনী গৃহের (Showroom) মধ্যে সোফায় শুইয়া বি-হাইভ চুরুট টানেন ও চুরুটের ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে হস্তস্থিত খবরের কাগজের সামাজিক সংস্কার,রাজনৈতিক আবর্ত্তন প্রভৃতি প্রবন্ধগুলা উড়াইয়া দেন—তখন পার্শ্বের গৃহে বসিয়া চোখে আই গ্লাস (Eye glass) লাগাইয়া হাতে উকা ধরিয়া মানিকচাঁদ ঘড়ি মেরামত করেন।

তাঁহাদের দোকানটী ঠিক সমুদ্রের ধারে অবস্থিত—ঘর খানি নাতিক্ষুদ্র নাতিবৃহৎ—সবে মাত্র দ্বিতল; তাও আবার মোটে দুই কামরা, নিচে তিন কামরা,; তার মধ্যে এক কামরা সোরুম—এক কামরা কার্য্য গৃহ বা অফিস আর এক কামরা কারখানা (Work shop উপরে তিনটী কামরার মধ্যে একটী পাক-গৃহ বা কিচেন্ আর দুইটীর মধ্যে একটীতে হীরাচাঁদ সস্ত্রীক থাকেন, অপরটীর অধিকারী মাণিকচাঁদ—তিনি অবিবাহিত।

সে একটী দিন, তখন সবে মাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। অন্ধকারটা তখনও বেশ তেমন জমাট ভাব ধারণ করে নাই, প্রতিমার এক মেটে করার মত হেথা হোথা খানিক খানিক তরল অন্ধকার ধরণীর গায় বিকীর্ণ হইয়াছিল - অদূরস্থ সমুদ্র বক্ষোত্থিত সান্ধ্য-শীতল বায়ু আসিয়া হীরাচাঁদের সোরুমে প্রবেশ করিয়া তাঁহার হস্তস্থ সংবাদ পত্রের কোণগুলিকে ঈষৎ আন্দোলিত করিতেছিল আর খানিকটা বাতাস অর্দ্ধোম্মুক্ত বাতায়নপথে প্রবেশ করিয়া কর্ম্মনিরত মাণিকচাঁদের ললাটস্থ স্বেদবিন্দুগুলিকে কাঁপাইতেছিল—এমন সময় অফিসঘরের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—মানিকচাঁদ হাতের কাজ টেবিলের উপর রাখিয়া আগন্তুকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে গেলেন।

.আগন্তুক একজন পার্শী,লোকটা বোম্বাই

শহরের একজন বিখ্যাত বদমাইস নাম—পেস্তনজী—হঠাৎ সে লোকটাকে দেখিয়া মাণিকচাঁদ আশ্চর্য্য হইলেন, বিস্ময় গোপন রাখিয়া বলিলেন "মহাশয়ের কি আবশ্যক" পেস্তনজী বুকপকেট হইতে কাগজমোড়া একটি কি পদার্থ বাহির করিয়া মাণিকচাঁদের হাতে দিলেন—তিনি খুলিয়া দেখিলেন উহা একটা স্প্রিং, ঠিক ঘড়ির স্প্রিংয়ের মতন নহে—একটু পার্থক্য ও বৈচিত্র্য আছে। ঘন বিন্যস্ত শ্মশ্রু ও গুম্ফের মধ্যবর্ত্তী কয়েকটী শ্বেতদন্ত বিকাশ করিয়া কর্কশ স্বরে পেস্তনজী বলিল "এইরূপ একটি স্প্রিং করিতে কত লাগিবে? ঠিক এইরূপ নহে এমন করিতে হইবে যাহা দম দিলে ঠিক এক ঘণ্টায় খুলিয়া যাইবে। সন্দিগ্ধচক্ষুদ্বয় আগন্তুকের মুখের উপর রাখিয়া মাণিকচাঁদ বলিল—ইহা কিরূপে কোথায় অবস্থিত ছিল ও কিরূপে ব্যবহৃত হইবে, না জানাইলে ইহা প্রস্তুত করিতে পারিব কি না বলিতে পারি না।" ঈষৎ বিরক্তির সহিত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পেস্তনজী কহিল "ইহা কেবল ক্লক ঘড়ির ঘুম ভাঙাইবার স্প্রিং (Alarming spring) রূপে ব্যবহৃত হইবে—তুমি প্রস্তুত করিতে পারিবে কি না বল অত বাজে কথায় তোমার কাজ কি?"

মাণিকচাঁদের একটু রাগ হইল—দৃঢ়তার সহিত বলিল "এরূপ স্প্রিং কখনও ঘুম ভাঙানর জন্য ব্যবহৃত হয় না, তোমার নিশ্চয়ই কোন দুরভিসন্ধি আছে—আমি ইহা প্রস্তুত করিয়া দিব না" "তাহলে দিবেনা—বেশ। বেশ ভাবিয়া দেখ পেস্তনজীর সহিত কথা কহিতেছ, এটা যেন স্মরণ থাকে—করিয়া দিলে প্রচুর অর্থ পাইবে—নতুবা কোপে পড়িয়া খুব সহজে নিষ্কৃতি পাইবে না, ক্রোধে মাণিকচাঁদের সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল সক্রোধে বলিয়া উঠিল "পাজী বদমায়েস তুমি আমাকে ভয় দেখাইতে চাও—আরও কি বলিতেছিলেন কিন্তু কথা ফুরাইবার পূর্ব্বেই দেখিলেন পেস্তনজী প্রস্থান করিয়াছে; কিন্তু যন্ত্রটি লইয়া যায় নাই। স্প্রিংটিকে হাতে করিয়া মাণিক চাঁদ কার্য্যগৃহে প্রবেশ করিলেন।

( ২ )

"চেয়ে দেখ কি সুন্দর রাত্রি, কি মধুর জ্যোৎস্না, ইচ্ছে করে ওই জ্যোৎস্না কিরণে ডুবে অনন্ত-নীলিমায় মিশে যাই, আর কেই সোণার মেঘের মাঝে দুজনে মিলে দুটি হীরের ফুলের মতন, দুটি তারার মত ফুটে উঠি" বাতায়ন সন্নিকটে উপবিষ্ট স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া মতি এই কয়েকটি কথা বলিল। হীরাচাঁদ মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন মতি; সাদরে সোহাগ ভরে বলিলেন "মতি জ্যোৎস্নাটা আবার তোমার মগজে প্রবেশ করিল কেন? দেখ যেন কবিতা টবিতা লিখোনা; তাহলে দরিদ্র স্বামীর উপর বড় অত্যাচার করা হবে, তোমার বই ছাপাবার খরচ আমি যোগাতে পারিবো না"। "না তোমার যে ভয় নেই, কবিতা টবিতা আমি লিখ্‌ছি না; আমি বলছিলুম আজকার রাতটা কি সুন্দর।" "কি রকম তোমার চেয়েও সুন্দর নাকি" "যাও। কেন, আমি না হয় কালই আছি, তা একটী সুন্দর দেখে আনন্দেরই কি পোড়া কে বারণ

কেননা বাস্তবিকই মতি-মাইয়ের রংটা খুব সুন্দর ছিল না তাই রংএর কথা উঠিলেই তাঁহাদের ঘরে খুব গড়িত। যাই হোক হীরা-চাঁদের উদ্দেশ্য অন্য ছিল—অমন সুন্দর জ্যোৎস্নাময়ী রজনী তিনি অভিমান ও কলহের নীরব শুষ্ক আঁধার পূর্ণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, তাই কথাটা চাপা দিবার জন্য বলিলেন "ছি ও কথা বলো না তুমি আমাব সুবর্ণ-লতিকা—তোমার চেয়ে সুন্দর আমি জগতে দেখি না—তবে একটি সুন্দর দেখে ভাইয়ের জন্য আনতে হবে বটে" এই কথায় পূর্ব্ব কথার স্রোত সহজেই পরিবর্ত্তিত হইল কারণ অনেক দিন হইতে মতি স্বামীকে দেবরের বিবাহের জন্য ব্যস্ত করিতেছিলেন এবং তাহার জন্য কত সদ্যুক্তিও দেখাইয়া-ছিলেন কিন্তু কর্ম্মব্যস্ত হীরাচাঁদ সে কথায় এতদিন কর্ণপাত করিতে পারেন নাই। আজ স্বামীর মুখে এই কথা শুনিয়া আগ্রহ সহকারে মতি এই প্রসঙ্গ আলোচনা কবিতে লাগিলেন। কোথায় কাহার সুন্দর অবিবাহিতা কন্যা দেখিয়াছিলেন তাহার উল্লেখও কাল্পনিক সমালোচনা করিতে লাগিলেন—কিন্তু কোনরূপ সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হইতে পারিলেন না তবে ইহা স্থিরকৃত হইল যে খুব শীঘ্রই মাণিকচাঁদের বিবাহ দিতে হইবে। এই দম্পতিযুগল যখন কল্পনার রাজ্য উপস্থিত হইয়া মাণিকচাঁদের জন্য একটী সুখময় ভবিষ্যৎ ছবি আঁকিতেছিলেন, কর্ম্মক্লান্ত মাণিক-চাঁদ তখন পার্শ্বকক্ষে অঘোরে নিদ্রা যাইতেছিলেন, মনুষ্যের যখন অদৃষ্টলিপি প্রস্তুত হয়, তখন সে অজ্ঞান থাকে। মানুষ যখন সোণালী তুলিকা হাতে করিয়া আশার সুখময় চিত্র অঙ্কিত করে—নিষ্ঠুর অদৃষ্ট-বিধাতা তখন নির্দ্দয়করস্পর্শে তাহা মুছিয়া দেন।

[illegible]

গভীরা রজনী—সমস্ত বোম্বাই সহরটা নিদ্রিত—সমুদ্রের নীল জলরাশি ও তরঙ্গহীন—অচেতন—আর তার সর্ব্বাঙ্গে সুমধুর জ্যোৎস্নার তরঙ্গ আসিয়া এক অলৌকিক সৌন্দর্য্য দান করিয়াছে—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সৌধগুলির পুরোভাগ জ্যোৎস্না লোক প্রতি-ফলিত—পশ্চাৎভাগে দীর্ঘাকৃতি মলিন ছায়া সমূহ নিপতিত—চন্দ্র-কিরণ প্লাবিত আকাশের স্থানে স্থানে যূথবিচ্যুত কৃষ্ণবর্ণ মেঘ—যেন কোন অসামান্যা রূপসী রূপার-কাটি স্পর্শে হতচেতন হইয়া নিদ্রিতা আর তাহার পরিধিত নীলাম্বরী শ্লথ ও স্থানচ্যুত হইয়া দেহের স্থানে স্থানে অসংলগ্ন ভাবে সংসক্ত—প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্য যেন অসীম করুণার অবিরল ধারায় বর্ষিত হইতেছে। এমন সময় হঠাৎ কামান গর্জ্জনের ন্যায় একটী বিকট শব্দ হইল আর সঙ্গে সঙ্গে হীরাচাঁদ মানিকচাঁদের দ্বিতল কুঠী ভূমিসাৎ হইয়া গেল—সমস্ত একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ ও সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইল—চাবিদিক বারুদের গন্ধে ও গাঢ় ধূমে পূর্ণ হইয়া গেল—হতভাগ্য নিদ্রিত অধিবাসী-গণ ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিল না—তাহারা যেমন ঘুমাইয়াছিল তেমনি অজ্ঞানে—অঘোরে তাহাদের নিদ্রা চির-নিদ্রায় পরিবর্ত্তিত হইল।

পরদিন প্রত্যুষে বোম্বাইয়ের সকল সংবাদ পত্রেই নিম্নলিখিত সংবাদ পাঠ করা গেল। ভীষণ দুর্ঘটনা গতরাত্রে এখানকার সুপ্রসিদ্ধ ঘড়ি-ব্যবসায়ী হীরাচাঁদ মানিকচাঁদের কুঠী কে ডিনামাইট নামক বিস্ফোরক সাহায্যে উড়াইয়া দিয়াছে, হতভাগ্য হীরাচাঁদ ও তাহার স্ত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন তাঁহার ভ্রাতা মাণিকচাঁদকে পুলিশ অর্দ্ধমৃত অবস্থায় সিঁড়ির পার্শ্বে দেখিতে পায়—তাহাকে সযত্নে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে—তাহার জীবন এক্ষণে সঙ্কটাপন্ন—তবে ডাক্তারেরা আশা দিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। পুলিশ খুব তদন্ত করিতেছে। এই দুর্ঘটনার অপরাধী যদি ধৃত না হয় তবে সুশাসিত ইংরাজ রাজ্য কলঙ্কে অর্পিত হইবে—বোম্বাইয়ের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী সহরের বক্ষের উপর এইরূপ ভীষণ ঘটনা হওয়ায় সকলে আশ্চর্য্য হইয়াছে ও পুলিশের কর্ত্তব্য জ্ঞানের উপর দোষারোপ করিতেছে—আমরা আশা করি পুলিশ শীঘ্রই প্রকৃত অপরাধীকে ধৃত করিয়া আদর্শ দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন—জনরবে প্রকাশ চুরিই নাকি ইহার মূল কারণ—দেখা যাউক পুলিশ কতদূর কি করিয়া উঠেন।"

( ৩ )

সাত দিনের পর মাণিকচাঁদ চোখ মেলিল—চাহিয়া দেখিল শিয়রে একজন কে বসিয়া রহিয়াছে—ক্ষীণ স্বরে বলিল "আমি কোথায়" ডাক্তার বাবু বলিলেন "আপনি বেশী কথা কহিবেন না—আপনি উত্তম স্থানেই আছেন"—রোগী ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া বলিল "আমার বাটীর সংবাদ জানেন কি?" গম্ভীর ভাবে ডাক্তার বাবু বলিলেন "জানি—আপনার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়া উভয়েই নিরাপদে আছেন—" "তাঁরা আমায় দেখ্‌তে আসেন নি—কেন" সন্দিগ্ধস্বরে রোগী এই প্রশ্ন করিলেন—ডাক্তার বাবু দেখিলেন প্রকৃত ঘটনা বলিলে আকস্মিক উত্তেজনায় রোগ বৃদ্ধি হইতে পারে, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত সম্ভব, সেই কারণে কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন "হাঁ তাঁহারা আসিয়াছিলেন—কিছুক্ষণ হইল গিয়াছেন—যাহা হউক, আপনি অধিক কথা কহিবেন না—একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করুন" এই বলিয়া রোগীর মুখে এক দাগ নিদ্রাকারক ঔষধ ঢালিয়া দিলেন—রোগী আবার ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িলেন প্রফুল্লতার একটী সুস্নিগ্ধ আলোক ডাক্তারের চোখে মুখে ফুটীয়া উঠিল—তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ও প্রাণপণ চেষ্টা যে সকল হইয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া তিনি ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেন।

দেড় মাস রোগ ভোগ করিয়া মাণিকজী সুস্থ হইলেন—তখন তাহার পূর্ব্ব কথা সব মনে পড়িল—পেস্তনজীর আগমন ও তাহার আশ্চর্য্য আচরণ, অধিকন্তু তাহার ভীতি প্রদর্শন—এই পেস্তনজীই যে তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার প্রাণনাশ করিয়াছে—তাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, এ বিষয়ে তাহার আর কোন সন্দেহই রহিলনা, গায়ে সামান্য মাত্র বল পাইলে, মাণিকচাঁদ একদিন পুলিশ অফিসে যাইয়া নিজের সন্দেহের কথা সমস্ত বলিলে ইনস্পেক্টর বেঞ্জামিনের নিকট

কথাটা খুবই সম্ভব বলিয়া বোধ হইল, তিনি পেস্তনজীকে গ্রেপ্তার করিবার ওয়ারেণ্ট দিলেন। যথা সময়ে অপরাধী ধৃত হইয়া আসিল, মোকর্দ্দমার সময়ে সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন—বোম্বের সর্ব্বপ্রধান ব্যারিষ্টার হিউয়োজ সাহেব পেস্তনজীর পক্ষ সমর্থনার্থ উপস্থিত; আর নষ্ট-বিত্ত দরিদ্র মাণিকচাঁদের পক্ষে একটা সামান্ত উকিলও উপস্থিত নাই। বাগ্মী ব্যারিষ্টার প্রমাণাদি দ্বারা দেখাইলেন, যে ঘটনার দিন রাত্রে তাঁহার মক্কেল পেস্তনজী বোম্বাই হইতে বহুদূরে অবস্থিত সাতারা নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন সুতরাং তাঁহার পক্ষে এ কার্য্য অসম্ভব—যদিও তাঁহার মক্কেল একজন দাগী আসামী তথাপি তিনি এ ঘটনায় সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী; কেবল একজন উন্মাদের কথায় তাহাকে দোষী প্রমাণ করা যাইতে পারা যায় না। ইতিপূর্ব্বে সরকারী ডাক্তারের পরীক্ষায় মাণিকচাঁদ বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া প্রমাণ হইয়াছিল। যাহাই হউক, বিচারপতি যদ্যপিও বুঝিয়াছিলেন যে এই দুষ্কর্ম্মের নেতা পেস্তনজী তথাপি তিনি প্রমাণাভাবে তাহাকে বেকসুর খালাস দিতে বাধ্য হইলেন। রাজদ্বারে নিরাশ হইয়া যখন মাণিকচাঁদ ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাহার মনে প্রতিহিংসার একটা বিরাট প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল; সে ভাবিল যখন রাজার কাছে সুবিচার নাই, ধর্ম্মের কাছে সুবিচার নাই, তখন কেন্ সে বিচারভার নিজ হস্তে গ্রহণ না করিবে? দন্তে দন্তে নিষ্পেষিত করিয়া মাণিকচাঁদ কহিল "পেস্তনজী তুমি ভাবিরাছ—রাজদ্বারে অব্যাহতি পাইলে বুঝিয়া বাঁচিয়া যাইবে। তাহা হইবে না—আমার দারুণ প্রতিহিংসা হইতে তোমাকে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না—তুমি জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যেখানেই যাও শয়তানের ন্যায় আমি তোমার অনুসরণ করিব—নিরীহের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের কি ফল—তাহা তোমাকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিব, এমন আদর্শ দণ্ডে তোমায় দণ্ডিত করিব যে ভবিষ্যতে তোমার ন্যায় ব্যক্তিরা আর কখনও নিরীহের প্রতি অত্যাচার করিতে পারিবে না।" জিঘাংসাপীড়িত হৃদয়ে মাণিকচাঁদ বোম্বাই ত্যাগ করিলেন।

( ৪ )

কলিকাতা এজরাষ্ট্রীটের পাশ দিয়া একটী সরু গলি গিয়াছে—এই গলিটী সামান্য দূর গিয়াই শেষ হইয়াছে এই পথটী অত্যন্ত সরু কদর্য্য ও অপরিস্কৃত। গলির দুই পার্শ্বে কতকগুলি প্রাচীন বাটী তন্মধ্যে অধিকাংশই দ্বিতল ও কোন কোনটী ত্রিতল, এই গলির অধিবাসী বৃন্দের মধ্যে অধিকাংশই পার্শী, দুই এক ঘর ট্যাঁস ফিরিঙ্গিও আছেন; এই গলির এক বাড়ীর দ্বিতল কক্ষে দুইজন পূর্ণবয়স্ক পার্শী বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, তন্মধ্যে একজন পাঠকের পরিচিত মিঃ পেস্তনজী, ইনি সেই বিচারের পরই বোম্বে ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছেন; অপর ব্যক্তি তাঁহার সহকারীর নাম এদেলজী; দুইজনেই ভোল ফিরাইবার জন্য কলিকাতায় উপস্থিত। অনেক কথাবার্ত্তার পর পেস্তনজী ডাকিল

ঐবর্‌"—"হুজুর" বলিয়া দ্বারদেশে একজন বেহারা-শ্রেণীর লোক আসিয়া দাঁড়াইল; পকেট হইতে দুটা টাকা ফেলিয়া দিয়া পেস্তনজী বলিল,—"মুন্না, শিগ্‌গির একটা ভাল হুইস্কী আন, আর দুটো লাইমেড আর খানিকটা বরফ—বুঝেছিস্?" "মুন্না সম্মতি-সূচক-ভাবে ঘাড় নাড়িয়া প্রস্থান করিল। মুন্না চলিয়া গেলে পেস্তনজী এদেলজীর দিকে ফিরিয়া কহিল "দেখ, এদেলজী, চাকরটা বড় ভাল—অল্পদিনের মধ্যেই কিরূপ বিশ্বাসী হইয়াছে দেখিয়াছ" আর বেশ চালাক কথা বলিবা মাত্র বুঝিয়া লয়" এদেলজী মুখ হইতে সিগারেট খুলিয়া লইয়া বলিল—'হঁ। এখন আমাদের এইরূপ চাকরই প্রযোজন ভগবান্‌ বেশ মিলাইয়া দিয়াছেন—ভগবান সহায় না থাকিলেকি আর আমরা বোম্বের ডিনামাইট মোকর্দ্দমায় খালাস পাই, ভাগ্যে ছোঁড়াটাকে পাগল প্রমাণ করা গেল, নইলে আজ কলিকাতার পরিবর্ত্তে শ্রীঘরের ভিতর বাস করিতে হইত—তবে আমি যে এ ব্যাপারে লিপ্ত ছিলাম তা কেউ সন্দেহ পর্য্যন্ত করে নাই। বলতে কি ভাই যখন ডিনামাইটের ফিউজে (Dynamite fuse) আগুন লাগাই তখন আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল"। তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া পেস্তনজী বলিল "নতুন লোক কিনা অল্পেই তোমরা ভয় পাও, পাঁচ সাত বৎসর এই কাজ কর্ত্তে কর্ত্তে বেশ পাকা ওস্তাদ হয়ে পড়বে" এমন সময় দ্বার উন্মোচনের শব্দ হইল, দুজনে সতর্ক হইয়া বসিল, একটু সহজভাবে বসিয়া উভয়ে সিগারেট টানিতে লাগিল, দুইটী পূর্ণ গ্লাস হাতে করিয়া মুন্না সেখানে প্রবেশ করিল, টেবিলের উপর গ্লাস দুইটি রাখিয়া বলিল "আর একটুখানি যে রয়ে আছে বোতলটা আনিব কি?" "না সেটুকু আর আনতে হবে না, যা তুই সেটুকু খে'গে যা" "ফেরৎ পয়সাকটা বলিয়া মুন্না একটা সিকি ও ছয়টা পয়সা টেবিলের উপর রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; মুন্নাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া পেস্তনজী ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "যা না বেটা সঙের মতন দাঁড়িয়ে রইলি যে? ভেবেছ পয়সাকটাও বক্‌সিস্‌ দেব তা হচ্ছে না" "আজ্ঞে গেলাস দুটো হযে গেলে ধুয়ে রাখব" মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে মুন্না এই কটি কথা বলিল পেস্তনজী ও এদেলজী উভয়ে মদ্য—লেমনেড বরফ-মিশ্রিত পানীয় নিঃশেষিত করিয়া শূন্যগর্ভ গেলাস দুইটি টেবিলের উপর রাখিলেন। মুন্না গেলাস লইযা চলিয়া গেল।

তৎপরে উভযে এক একটি চুরুট বাহির করিযা ধরাইলেন, নানারূপ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। ক্রমশঃ উভয়ের নিদ্রাবোধ করিতে লাগিলেন, মনে হইতে লাগিল যেন অদৃশ্য মাযাময় বিষম কুহেলিকা তাহাদের সমস্ত শরীর ব্যাপ্ত করিতেছে। পেস্তনজী এদেলজীকে বলিল "আজ নেশাটা বড় জমকালগোছ হইবে এরি মধ্যেই বেশ গোলাপী গোছ লাগিয়াছে" "আমারও বড় নিদ্রাবোধ হইতেছে বলিয়া এদেলজী সোফাতেই পাশ ফিরিয়া ঘুমাইয়া পড়িল আর পেস্তনজীও মদিরামোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

হঠাৎ রাত্রে পেস্তনজীর বোধ হইল যেন কে তাহাকে রজ্জু দিয়া দৃঢ়রূপে সোফার সহিত বাঁধিতেছে, পেস্তনজী ভাবিল এও বুঝি নেশা ; আলোক প্রজ্বলিত করিবার জন্য দিয়াশালাই বাহির করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া বুঝিল যে ইহা স্বপ্নও নহে, নেশাও নহে, সত্য সত্যই তাহার দুইখানি হাত ও পা দৃঢ়রূপে সোফার পশ্চাৎদিকে আবদ্ধ রহিয়াছে ; ক্রোধে ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া পেস্তনজী কহিলেন "এদেলজী —বিশ্বাসঘাতক ভাবিয়াছ আমাকে এই ঘরে অসহায় অবস্থায় হত্যা করিয়া সমস্ত টাকা নিজে ভোগ করিবে, তাহা হইবে না—মুন্না মুন্না। সেই নির্জ্জন অন্ধকারকক্ষ প্রতিধ্বনিত পেস্তনজীর চীৎকার এদেলজীর কর্ণে বজ্র-নিনাদের ন্যায় শ্রুত হইল, তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ; উঠিতে গিয়া দেখিল তাহার হস্তপদ সোফার সহিত পশ্চাৎ হইতে আবদ্ধ। এদেলজী কিছুই ব্যাপার অবগত না হইয়া বলিল "কৃতঘ্ন—বেইমান—নিমকহারাম ! তুমি আমায় খুন করিয়া চোরাই মাল একেলা ভোগ করিবে ঠাওরাইয়াছ—তা হচ্ছে না। মুন্না - মুন্না" এমন সময় রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিয়া এক হস্তে একটী উজ্জ্বল বর্ত্তিকা অপর হস্তে বস্ত্রখণ্ড লইয়া মুন্না সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। বর্ত্তিকার উজ্জ্বল আলোকে উভয়ে সবিস্ময়ে দেখিল উভয়েরই হস্তপদ আবদ্ধ। সর্ব্বাগ্রে চীৎকার করিয়া উভয়ে বলিল "মুন্না বিশ্বাসঘাতক—তোর এই কাজ" বাধা দিয়া জীমূত মন্দ্রে হুঙ্কার করিয়া মুন্না বলিল "চুপ্ কর বৃথা কেন গোল করিবে, তোমাদের চীৎকার এই প্রাচীর ভেদ করিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির কর্ণে পৌঁছাইবার কোন আশাই নাই আর যাহাতে তোমারা চীৎকার করিয়া আমার কার্য্য পালনে বিঘ্ন করিতে না পার তাহার উপায়ও "করিয়াছি" এই বলিয়া সেই আনীত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা উভয়েরই চীৎকারের পথ রুদ্ধ করিয়া দিল। মনে মনে ভাবিল, কি জানি প্রাণভয়ে ভীত কাপুরুষদের করুণ চীৎকারে যদি মনে দয়া উপস্থিত হয়, যদি আমার বজ্র-দৃঢ় চিত্তকে দুর্ব্বল করে, তাহা হইলে এত কষ্ট, এত যত্ন সব পণ্ড হইয়া যাইবে, কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে।

বাক্‌শক্তি-রহিত হস্তপদাবদ্ধ জীবদ্বয় করুণ-নেত্রে মুন্নার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—তাহারা যেন নীরবে বলিতেছিল "দয়া কর, প্রাণভিক্ষা দাও, ক্ষমা কর"—বাতীর আলোকে মুন্না দেখিল—যে দুইখানি মুখে দিবারাত্র পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার কালিমা লিপ্ত থাকিত, তাহাতে এক্ষণে ভয়, উদ্বেগ ও অনুতাপের স্পষ্ট চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সেকক্ষ ত্যাগ করিয়া মুন্না বাহিরে চলিয়া গেল। এদেলজী পেস্তনজী নিরুপায় হইয়া ছট্ ফট্ করিতে লাগিল ; তাহাদের মনে হইতে লাগিল—ভয় আর উদ্বেগ যেন তাল পাকাইয়া তাহাদের প্রাণটাকে ক্রমাগত কণ্ঠনালীর দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। অল্পক্ষণ মধ্যেই মুন্না ফিরিয়া আসিল, তাহার একহস্তে ঘড়ির মতন একটী যন্ত্র, অপর হস্তে তরল পূর্ণ একটী ক্ষুদ্র পাত্র আর মুখে একটা পৈশাচিক আনন্দ।

টেবিলের উপর ঘড়িটি স্থাপন করিয়া—

তাহার উপরিভাগে একটী স্প্রিংয়ে যুন্না যন্ত্র দিয়া দিল। স্প্রিং হইতে যে দুইটি তার বহির্গত হইয়াছিল সেই দুটিকে অদূরবর্ত্তী বারুদপূর্ণ বাটীর সহিত উত্তমরূপে সংযুক্ত করিয়া যুন্না বলিল "পেস্তমজী এদেলজী তোমাদের বোধ হয় মনে পড়ে তিন বৎসর পূর্ব্বে তোমারা অকারণে এক নিরপরাধী পরিবারের সর্ব্বনাশ করিয়াছ; তাহারা তোমাদের নিকট কোন অপরাধ করে নাই, তবু তুমি তাহাদের এক ভাইকে প্রাণে মারিয়াছ, আর এক ভাইকে পথের ভিখারী করিয়াছ। আমিই সেই সর্ব্বস্বান্ত মাণিকচাঁদ—প্রতিহিংসার সুযোগ খুঁজিতেছিলাম। তোমরা ভাবিয়াছিলে রাজদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইলে বাঁচিয়া যাইবে, না তাহা হইবে না আজ তোমাদের সেই হত্যার কৈফিয়ৎ দিতে হইবে—তবে আমি তোমাদের অনুতাপ করিবার যথেষ্ট সময় দিলাম,জীবনে যত পাপ করিয়াছ, সব স্মরণকর, আর তার জন্য কাঁদ—যতক্ষণ চক্ষু ফাটিয়া রক্ত পড়ে ততক্ষণ কাঁদ; এই সবে মাত্র ২টা বাজিয়া ৩ মিনিট, যেমন ৩টা বাজিবে অমনি ঐ ঘড়ির মাথার স্প্রিংটী কাঁপিয়া উঠিবে,আর ঐ ডিনামাইটের পাত্র সংলগ্ন বৈদ্যুতিক তার দুইটি পরস্পরকে স্পর্শ করিবে, আর তাহার পর তোমাদের জীবনের শেষ হইয়া যাইবে—এই যন্ত্রই প্রস্তুত করিবার জন্য তুমি আমার দোকানে স্প্রিং করাইতে গিয়াছিলে না? দেখ তোমারই উদ্ভাবিত যন্ত্র কেমন করিয়া—তোমার মরণের পথ সাফ্ করে।"

মাণিকচাঁদ ওরফে যুন্না এই কথা বলিয়া ধীরে ধীরে সে কক্ষ ত্যাগ করিল—সঙ্গে তাহার পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ হইল।

উপায়-বিহীন অপরাধীদ্বয় বসিয়া ভীষণ মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; কি ভয়ানক! নড়িবার যো নাই, কথা কহিবার যো নাই কেবল নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া নিশ্চিত মৃত্যুর প্রতীক্ষা—হতভাগ্যদ্বয়ের চক্ষু ফাটিয়া বাস্তবিকই শোণিত নিপতিত হইতে লাগিল। অসহ্য যন্ত্রণা বুকে করিয়া দুর্ভাগ্যেরা বসিয়া রহিল;আর টেবিলস্থিত ঘটিকাটি যেন তাহাদের দারুণ মানসিক বেদনাকে উপহাস করিয়া বলিতে লাগিল টিক্, টিক্, টিক্!

* * * *

তৎপরদিন কলিকাতার সকল সংবাদ পত্রে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইল—দুর্ঘটনা—এজ্রাষ্ট্রীট বাইলেনের অমুক নং বাটী অকস্মাৎ কাল রাত্রে পড়িয়া গিয়াছে দেখিলে বোধ হয় যেন ভূকম্পনে পড়িয়াছে; কেবল দুইজন পার্শী ভদ্রলোক্ চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছেন, কি কারণ বাড়ীটি পড়িল স্থিরীকৃত হয় নাই; পুলিশ তদন্ত করিয়া বলেন বাড়ীটির অবস্থা অত্যন্ত জীর্ণ হইয়াছিল কিন্তু গুজবে প্রকাশ ইহা কেহ ডিনামাইট করিয়া উড়াইয়া দিয়াছে।

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

# ঢাকার প্রতিষ্ঠাতা।

## ঢাকার আদিম ইতিহাস।

"ঢাকা"—এই শব্দটীর কোথা হইতে উৎপত্তি, এ নাম কেন হইল,—ইতিহাসে তাহার কোন সদুত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সাধারণতঃ যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করা হয়, তাহার অধিকাংশই কিংবদন্তী-মূলক। কাহারো কাহারো মতে,—যে স্থানে বর্ত্তমান ঢাকা নগরী প্রতিষ্ঠিত "বুড়ী গঙ্গার" সেই স্থানে, অতি প্রাচীনকালে বহুল পরিমাণে "ঢাক" নামক বৃক্ষ (Butea Frondosa) জন্মিত,—এই "ঢাক" বৃক্ষ হইতেই ঢাকা নামের উৎপত্তি। অপর কেহ কেহ বলেন-যে বাঙ্গালার কৌলীণ্য প্রথার প্রচলন-কর্ত্তা রাজা বল্লাল সেনের প্রতিষ্ঠিত ঢাকেশ্বরী নামক দুর্গা মন্দিরের নাম হইতেই নগরটী তন্নাম-ধেয় হইয়াছে। ঐতিহাসিকদিগের মতে উক্তরূপ নাম-রহস্য কিংবদন্তী-মূলক বলিয়া প্রামাণিক এবং বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।

আবার কেহ কেহ বলেন,—বাঙ্গালার মোগল শাসন কর্ত্তা ইসলাম খাঁ এই নগরের সংস্থাপক। এই মতটীই ঐতিহাসিক দিগের মতে বিশ্বাসযোগ্য। এই ইসলাম খাঁর সময়ে আফগান এবং মগেরা তাঁহার "রাজ্যের" পূর্ব্বসীমা ও বহিঃস্থ জনপদ সকল হইতে আসিয়া পুনঃ পুনঃ আক্রমণে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। তাঁহাদের শাসনের জন্য তিনি "রাজ মহল" হইতে রাজধানী "নীজামতের" আরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব দিকে স্থানান্তরিত করেন। রহমান্ আলী লিখিত "তারিখই ঢাকা" নামক পাণ্ডুলেখ্যে (মূল্যমানীয় গ্রন্থে) এই রূপ লিখিত আছে—বাঙ্গালার মোগল শাসনকর্ত্তা সেখ ইসলাম খাঁ ১৬০৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার রাজধানী স্থাপনের যথোপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচনের জন্য বহুনৌবাহিনী সমন্বিত এক রাজকীয় তরণীতে বহির্গত হয়েন। যে স্থানে বর্ত্তমান নগর প্রতিষ্ঠিত তাহার পরপারে উপনীত হইয়া ইসলাম খাঁ স্থানটী স্বাভাবিক গঠনে যুদ্ধোপযোগী ও সুরক্ষিত দেখিয়া ভাবী রাজধানীর জন্য পছন্দ করিলেন। নৌকা সকল তীরাভিমুখে আনীত হইলে তিনি ভূমিতে অবতরণ করিয়া স্থানটী উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। যে স্থানে তিনি অবতরণ করেন সে স্থানটী অদ্যাপি তদীয় নামানুসারে ইসলামপুর নামে অভিহিত। প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে দেখিলেন—এক দল লোক ঢক্কা-বাদ্য-সহকারে কোন দেবতার পূজা করিতেছে। তখন তাঁহার মস্তিষ্কে এক অদ্ভুত খেয়াল উপস্থিত হইল! তিনি বাদ্যকর দিগকে একস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া যথাশক্তি জোরে বাজাইতে বলিলেন এবং সেই সময়ে তাঁহার তিন জন অনুচরকে আদেশ করিলেন—"তোমরা প্রত্যেকে এক একটী পতাকা লইয়া এক জন পূর্ব্ব, এক জন পশ্চিম ও অপর এক জন

উত্তর দিকাভিমুখে ক্রমাগত অগ্রসর হও এবং যেখানে আর ঢক্কানিনাদ শ্রুতিগোচর হইবে না দেখিবে, সেই স্থানে পতাকা দণ্ড প্রোথিত কর।" পরে, যে যে স্থানে পতাকা দণ্ড প্রোথিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে এক একটী সীমাসূচক স্তম্ভ নির্ম্মিত করাইলেন। এইরূপে তাঁহার সঙ্কল্পিত রাজধানীর পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর সীমা নির্দ্ধারিত হইল, এবং "বুড়ীগঙ্গা" দক্ষিণ সীমা রূপে রহিল। ঢক্কানিনাদ সাহায্যে স্থান ও আয়তন নির্দ্ধারিত হইল বলিয়া ইস্‌লাম খাঁ তাঁহার এই নবপ্রতিষ্ঠিত রাজধানীর নাম ঢাকা রাখিলেন।" উপরুক্ত কাহিনী সত্য বলিয়া প্রতীত হয়; কারণ এই ঘটনার অর্থাৎ ১৬০৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে, ইতিহাসাদির কোন স্থানে 'ঢাকা' নামের উল্লেখ দেখা যায় না। উক্ত বিবরণ সত্য বলিয়া নির্দ্দেশের আরও কারণ এই—যখন ইস্‌লাম খাঁ কৃত কোন রাজকার্য্যের পারিতোষিক স্বরূপ সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে প্রচুর রাজসম্মান লাভ করিয়াছিলেন তখন তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য রাজধানী ঢাকার নাম "জাহাঙ্গীর" নগর রাখিয়া সম্রাটকে সম্মানিত করেন। মুসলমান ইতিহাস বেত্তা ও মুসলমান কবিদিগের ইতিহাস কাব্যাদিতে "জাহাঙ্গীর" নগর এই নাম দৃষ্ট হয়।

এখন এই ইস্‌লাম খাঁ সম্বন্ধে কিঞ্চিত বলা আবশ্যক। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা এই—বাল্যাবধি তিনি আমার সহিত প্রতিপালিত এবং আমার অপেক্ষা এক বৎসরের ছোট। তিনি বড় সাহসী ও মধুর প্রকৃতি ছিলেন। অদ্যাবধি তিনি কোন মাদক দ্রব্য স্পর্শ করেন নাই। তিনি আমার প্রতি এত অনুরক্ত ছিলেন যে আমি তাঁহাকে ফ্রাজান্দ বা পুত্র নামে সম্মানিত করিয়াছিলাম। ইস‌লাম খাঁ সম্রাটের কিরূপ প্রিয়পাত্র ছিলেন তাহা এই বিবরণ হইতে জানা যায়।

## আফগান আক্রমণ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে দুর্দ্ধর্ষ আফগান এবং মগদিগের আক্রমণের প্রতিবিধানকল্পে ইসলাম খাঁকে রাজধানী স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছিল। মোগলেরা আফগানদিগের নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে সমস্ত রাজ্য অধিকৃত করিয়া লয়। শেষে তাহারা অধিকতর দৃঢ়তার সহিত শেষসম্বল সীমান্তপ্রদেশ অধিকার করিয়া রাখে। আফগানেরা যোদ্ধার জাতি,তাহাদের কখন নেতার অভাব হয় নাই। টোডরমল্লের কূটরাজনীতির ও রাজা মানসিংহের রণ-কৌশল একাল পর্য্যন্ত কতলুখাঁর হঠাৎ উড়িষ্যায় প্রদেশের আধিপত্যে বাধা প্রদানে সমর্থ হয় নাই। কতলুখাঁর হঠাৎ মৃত্যু হইলে পর মোগলেরা ভাবিলেন—কণ্টকের উচ্ছেদ হইল। কিন্তু দেখিতে দেখিতে উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র ওসমান খাঁ মস্তক তুলিয়া দেখা দিলেন। ওসমান আজন্ম যোদ্ধা ছিলেন। তিনি পিতার সদ্‌গুণাবলী পাইয়াছিলেন। বুনসী নদীর তীরবর্ত্তী গৌরীপাড়া, গৌনকপাড়া, ভুমরয়, এই সকল স্থানের দুর্গ তখন আফগানদিগের অধিকারে ছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে বঙ্গে আফগান-প্রভাপ বড়

সীমার ছিল না। রাজমহলে মানসিংহ কর্তৃক পরাভূত হইবে পর ওসমান সেই প্রদেশের পূর্ব্বাংশে অবস্থান করিতে লাগিল। তখন তাঁহার অধীনে ৭০০০ অশ্বারোহী এবং ৬০০০ পদাতিক ছিল। ইসলাম খাঁর ইচ্ছা বিনা রক্তপাতে শত্রুতার উচ্ছেদ হউক। সে জন্ত তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিয়া একজন দূতকে আফগানদিগের সমীপে প্রেরণ করিলেন। ওসমান কিন্তু সন্ধির প্রয়াসী নন তিনি দূতকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইহাতে ইসলাম খাঁ অগত্যা একদল সৈন্তসহ বিখ্যাত সেনানায়ক সুজাৎ খাঁকে আফগানের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। ওসমান খাঁও যুদ্ধদানে কৃতসংকল্প হইয়া ১০,০০০ সৈন্তসহ, ঢাকার নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর তীরে মোগলদিগের সম্মুখীন হইলেন। ( মহরম ৯,১০২১ অব্দ, ইংরাজী ১৬১২ খৃঃ অঃ)। যুদ্ধ সময় ইসলাম খাঁ যুদ্ধক্ষেত্রের দুই মাইল দূরে কোন স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। যখন দেখিলেন ভাগ্যলক্ষ্মী তাহার অনুকূল বোধ হইতেছে না তখন তিনি সুজাৎখাঁর সাহায্যার্থ একদল সৈন্ত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও মোগলগণের কোন সুবিধা লক্ষিত হইল না। সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। যুদ্ধেরও নিবৃত্তি নাই। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গে মোগলের সৌভাগ্যরবিও বুঝি অস্তমিত হয়। এমন সময়ে সহসা একটা গোলা আসিয়া ওসমান খাঁর কপাল দেশে আঘাত করিল, পাঠানদের কপালও সেই সঙ্গে ভাঙ্গিল। ওসমান হস্তিপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইলেন। তাঁহার ভ্রাতা আসিয়া তাঁহাকে রণক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরিত করিবার জন্য এক ডুলি করিয়া তাহাকে ঢাকায় পাঠাইলেন। পথিমধ্যে ওসমান খাঁর মৃত্যু হয়। বলা বাহুল্য, সেনাপতির অকস্মাৎ পতনে বিশৃঙ্খল হইয়া পাঠানেরা সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত হইল।

## দুই ধূমকেতু—মগ ও পর্টুগীজ।

তখন বঙ্গের আকাশে দুই ধূমকেতুর যুগপৎ উদয় হইয়া বঙ্গবাসীকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছিল। ধনপ্রাণ লইয়া কেহ নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করিতে পারিত না। বঙ্গের শাসনকর্ত্তা পাঠান-দিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত। সুতরাং পর্টুগীজ ও মগ দস্যুগণের স্বাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। উপযুক্ত শাসন ও বাধার অভাবে তাহাদের প্রতাপ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পূর্ব্ব-বঙ্গ তাহাদের তাণ্ডবনৃত্যে থরথর কম্পমান। আরকান প্রদেশের দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশ সকল হইতে বহির্গত হইয়া মগ-দস্যুরা বঙ্গবাসীগণের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে লাগিল। মোগল শাসনকর্ত্তা আপনার স্বাধীনতার জন্য পাঠানদের সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত, এদিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই। মগের অত্যাচারে বাঙ্গালার পল্লীগুলি শ্মশানকল্প হইয়া উঠিল, শত শত নিরীহ প্রজা বন্দীকৃত হইয়া মগদস্যুগণের দাসত্বে নিয়োজিত হইল। ইহাতেই প্রজাগণের লাঞ্ছনার শেষ হইল না। তাহাদের এই অরক্ষিত ও নিঃসহায় অবস্থা দেখিয়া আর এক লুণ্ঠন-পরায়ণ জাতির লোলুপ দৃষ্টি তাহাদের উপর নিপতিত হইল। বঙ্গের প্রাচীন পর্টুগিজ ঔপনিবেশিকেরা দুর্দ্দান্ত অকুতোভয় দস্যু অপেক্ষা কোন অংশে হীন

ছিল না। জলে এবং স্থলে দস্যুতাই তাহাদের জাতীয় ব্যবসায় ছিল। তাহারা নৌকাপরিচালনে সুনিপুণ ছিল। গঙ্গা, স্বরস্বতী এবং পূর্ব্ববঙ্গের নদীবক্ষ সেই সকল পর্টুগীজ দস্যুর লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিল। সুবিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক ফ্রান্সিস বার্ণেয়ার তাঁহার লিখিত ইতিহাসের একস্থানে তৎকালীন পর্টুগীজ দস্যুগণের লুণ্ঠন ব্যাপার ও অত্যাচার কাহিনী জ্বলন্তভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। সেই হৃদয় বিদারক বিবরণ পাঠ করিলে অশ্রু সংবরণ করা যায় না।

ফার্সী ভাষায় একটী প্রবাদ বচন আছে এক কম্বলে একশত ফকিরের স্থান হইতে পারে কিন্তু এক মুলুকে দুই বাদসাহের স্থান সঙ্কুলান হয় না।" পর্টুগীজ আধিপত্য মগদিগের সহ্য হইলনা। আরাকানের রাজা পর্টুগীজ দিগের বিনাশ সাধনের জন্য অন্তত তাহাদিগকে তাহার রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য কৌশল অবলম্বন করিতে লাগিলেন। কিন্তু একে একে তাহার সমস্ত কৌশল বিফল হইল। পর্টুগীজদিগের বিক্রমের কিছুমাত্র হ্রাস হইলনা। তাহারা সেবাস্তিয়ান গঞ্জালীন নামক একজনকে তাহাদের নেতৃত্বে বরণ করিল। কথিত আছে গঞ্জালীন বিশ্বাসঘাতকতাসহকারে একসহস্র মুসলমানের প্রাণসংহার করিয়া সন্দীপ নামক দ্বীপে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিলেন, তাঁহার অধীনে তখন ১০০০ পর্টুগীজ ২০০০ কালা সিপাহী ২০০ অশ্বারোহী এবং ৮০টি সুসজ্জিত রণ-তরী ছিল।

এদিকে ইস্‌লাম্ খাঁ যখন মগ ও পর্টুগীজদিগের উচ্ছেদ সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন তখন তাহারা একত্রে মিলিত হইল। মোগল দিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য পর্টুগীজেরা মগদলপতি আরাকান রাজের সহিত সন্ধি স্থাপন করিল এবং পরস্পর সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল; মগেরা স্থলযুদ্ধ ও পর্টুগীজেরা জলযুদ্ধে সুনিপুণ। তাহারা ঢাকা নগরী আক্রমণ করিয়া অধিকৃত করিতে মনস্থ করিল, স্থির হইল মগেরা স্থলপথে এবং পর্টুগীজেরা মোহনা দিয়া ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হইবে এবং ঢাকার নীচে কোনস্থানে সম্মিলিত হইয়া এককালে ঢাকা আক্রমণ করিবে। ইসলাম এদিকে নিশ্চিন্ত ছিলেন না। শত্রুদিগের গতিবিধি পূর্ব্ব হইতে অবগত হইয়া মগদিগের গতি অবরোধ করিবার জন্য একদল অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইলেন। মগেরা পথি মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইল। পর্টুগীজ দিগের সহিত আর যোগদান করিতে পারিল না। এদিকে পর্টুগীজ সেনাপতি সীবাষ্টিয়ান গাঞ্জালীন আর অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না তিনি সন্দীপে আশ্রয় লইলেন।

হিজির ১০০২ অব্দে (ইংরাজী ১৬১৩ খৃঃ অঃ) পঞ্চম বৎসর কাল শাসনের পর ইসলাম খাঁর ঢাকায় মৃত্যু হয়।

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য বি, এ।

# লক্ষ্মী-পূর্ণিমা।

১

হে রূপসি গরীয়সি হে মনোরঞ্জিনি !
মম গৃহে, হৃদি-পদ্মে, বসে একাকিনী,
ঢালিতেছ কি অমিয়া. মাথার উপর,
ভেসে যায় তোয়শূন্য হিমাভ-অম্বর,
সম্মুখেতে শ্যাম-শস্যপূর্ণ-বসুন্ধরা !
যেন কার স্নেহ-সিক্ত আশীর্ব্বাদ-ভরা,
মাতাল বাতাস আসি করে আলিঙ্গন,
কুসুম-সুবাস দেয় নির্জ্জন বিপিন।
অন্তরে উথলি উঠে আনন্দের ঢেউ,
নষ্টপ্রায় খৈয়ানদী দেখেনাত কেউ।
সায়াহ্ন আকাশ হ'তে যেন দেববালা,
সুদূর দিগন্তগলে দেয় স্বপ্ন-মালা।
কিন্তু অয়ি হৃদি-লক্ষ্মী ! তোমার সঙ্গীতে—
ডুবে গেল ব্যাথা শত, নীরব নিশিতে !

( ২ )

অই দেখা যায়, মায়ের আলয় !
চূড়া অলঙ্কৃত—জ্ঞান-পতাকায় !
বিদ্যা-জ্যোতিঃ ধরে অরুণ আভায় !
জগত-আঁধার নাশিতে !
পর্ব্বত-প্রাচীর, সাগর-প্রাকার,
শ্যাম-ছায়াতলে শান্তির আগার,
যোগাও সঞ্চিত অক্ষয়-ভাণ্ডার,
পূর্ণ ধন-ধান্য-রাশিতে,

কত কুঞ্জবন প্রসূন-শোভিত !
কত দ্রুমদল ফল-ভার-নত,
পক্ষি-কাকলিতে সদা মুখরিত !
ধবলিত শশিহাসিতে !

স্বর্গ হ'তে উচ্চ সুপবিত্র স্থান,
চির-শান্তি সুখ সৌভাগ্য-নিদান,
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের সোপান,
প্রাণ চায় ভালবাসিতে !

কে আছ সন্তান, হও আগুয়ান্,
মাতৃ-সেবা-ব্রতে কর আত্মদান,
মায়েব প্রসাদে হও বলবান্,
চির-সুখ স্রোতে ভাসিতে !

শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী।

---

# পুরাতন ও নূতন।

মানব জীবনে যখন একটা বিষয় ক্রমাগত আলোচিত হইতে থাকে তখন তাহা ক্রমে ক্রমে পুরাতন হইয়া যায়। একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ আমি শৈশবাবস্থা হইতে দেখিয়া আসিতেছি সেটী এখন আমাকে আর ভাল লাগেনা কারণ সেটী আমার নিকট পুরাতন। শৈশবে গৃহ-সন্নিকটস্থ পুষ্করিণীর শৈবালাচ্ছন্ন সোপান গুলিতে উপবেশন করিতাম ; পার্শ্বের কচুবনের ভিতর দিয়া এক একটা বাতাস দিশে-হারা হইয়া ছুটিয়া আসিত। বকুল গাছটীর ফুলগুলি বৃন্তচ্যুত হইয়া ভূমিতল আচ্ছন্ন করিয়া দলিত-সৌরভে দিক্ মাতাইয়া তুলিত। মনে পড়ে তখন যেন আমার মন, সম্যকরূপে উক্ত বস্তুগুলিতে আকৃষ্ট হইয়া একটা বিমল আনন্দ অনুভব করিত। কিন্তু এক সময় কেন তাহারা আনন্দ দান করে না ? সকলেই একবাক্যে উত্তর দিবেন তাহারা পুরাতন। আমি একটী পাঠ ভাল করিয়া অভ্যাস করিলাম ; তার পর আমি আর একদিন সেই পাঠটী অভ্যাস করিতে গিয়া দেখিলাম বিনা আয়াসেই তাহা অভ্যস্ত হইল। ইহার কারণ কি ? সকলেই বলিবেন পাঠটী পুরাতন ছিল বলিয়াই এত সহজে অভ্যস্ত হইয়াছে।

মানবের নিকট একটী বিষয় চিরকাল চিত্তাকর্ষক হয় না। কথায় আছে চিরকাল এককায ভাল লাগে না। সুতরাং পুরাতন দ্রব্য কিরূপে মানবের চিত্ত আকর্ষণ করিবে ? মানব নূতনত্বের (Novelty) প্রয়াসী। নূতন দ্রব্য তাহার চিত্তাকর্ষক। পুরাতন তাহার রুচি-বিরুদ্ধ।

এই কথা বলিয়াই আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। কারণ পুরাতন সময়ে সময়ে মানব-চিত্ত আকর্ষণ করে, অর্থাৎ কখন কখন পুরাতনও মানবের নিকট নূতনের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ইহার উদাহরণ বোধ হয় দিতে হইবে না। বৃদ্ধ, গতশৈশব ও হৃত-সুখ ব্যক্তি ইহা অবগত আছেন। পুরাতন নূতন করিয়া কাব্য মানবকে মুগ্ধ করে। কবি পুরাতন নূতন করিতে সর্ব্বদাই ব্যস্ত। বৃদ্ধ তুমি শিশুর হাসি দেখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কর কেন ? অগ্রে হাসির প্রতি এক বার ভ্রূক্ষেপ করিতে না, আজ কি ভাব-অন্তরে আনিয়া নির্ণিমেষ-নেত্রে, নিস্পন্দ-শরীরে সেই হাসির ভাবময় সৌন্দর্য্যে গাত্র ঢালিয়া দিয়াছ। যুবক ! কৌমুদীভূষণা রজনী অনেক দেখিয়াছ। সেই অভ্যস্তা অযাচিতা রজনী আজ এত গৌরবময়ী কেন হইল ? আর হে কবি,যে সময়কে এক কালে তুমি গ্রাহ্য কর নাই তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কেন তুমি গাহিতেছ, Sweet childish da ys that were as long as twenty days are now. আর যে ইন্দ্রধনু এককালে তুমি একটা প্রাকৃতিক ঘটনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে তাহা দেখিয়া এতকাল পরে,হে নূতনত্ব প্রয়াসী মানব, কেন তুমি গাহিলে "My heart leaps up when I behold a rain bow in the sky.পুরাতনে এত আকর্ষণী শক্তি যদি বিদ্যমান রহিল, তাহা হইলে নূতনে পুরাতনে প্রভেদ কি ? নূতন ও পুরাতন দুইটী বিরুদ্ধার্থবাচক শব্দ। দেখা যাক্ ইহাদের কি প্রভেদ বিদ্যমান।

একটু চিন্তা করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়, পুরাতন যখন নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তখন তাহার কতকগুলি গুণ ( Attributes ) আমাদের অজ্ঞাত থাকে। পুষ্করিণী-সোপান যখন আমার চিত্তাকর্ষণ করিল, তখন তাহার কতকগুলি গুণ অথবা অন্তর্নিহিত শক্তি আমি জানিতে পারিলাম, যখন সেই গুণ অথবা শক্তি ব্যতীত আর কিছু আমি জানিতে পারিলাম না তখন কিছুকাল পরে আমি নূতনত্ব-প্রয়াসী হইয়া বুঝিলাম পুষ্করিণী-সোপান পুরাতন হইয়া গিয়াছে। একজন কৃষকের নিকট একটী বৃক্ষপত্র পুরাতন, কারণ তাহার জ্ঞানানুসারে সে সেই বৃক্ষ-পত্রের বিষয় অবগত আছে ; কিন্তু বৈজ্ঞা-কের নিকট সেই বৃক্ষপত্র চিত্তাকর্ষক, অতএব নূতনের মত। ইহাতে বুঝা যায়, যাহা জ্ঞাত তাহা পুরাতন, যাহা জ্ঞাত ছিল না তাহা নূতন। বাল্যকালে পুষ্করিণী-সোপান কেবলমাত্র ক্রীড়াস্থান বলিয়া জানিতাম। সেই অর্থে ( Connotation ) তাহা পুরাতন হইয়াছিল। তার পর যখন জানিতে পারিলাম, পুষ্করিণী সোপান কেবলমাত্র ক্রীড়াস্থান নহে, ইহার সহিত

আমার অতীত-জীবনের ইতিহাস সম্বন্ধ আছে তখন তাহা নূতন বলিয়া বোধ হইল ; তাহা পূর্ব্বের অর্থ (Connotation) ত্যাগ করিয়া একটা নূতনভাব হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া আমাকে আকর্ষণ করিল। সে ভাবও যখন পুরাতন হইল তখন আর তাহা চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিল না। রজনী কেবলমাত্র নিদ্রার সময় বলিয়া যখন আমি বুঝিলাম তখন হইতে তাহার চিত্তাকর্ষণ করিবার শক্তি একটু একটু করিযা হ্রাস হইতে লাগিল। তারপর যখন বুঝিলাম রজনী কেবলমাত্র নিদ্রার সময় নহে ইহা আরও কিছু, তখন তাহা আবার চিত্তাকর্ষণ করিল। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, জ্ঞান দ্রব্যকে পুরাতন ও নূতন করিয়া দেয়। একটা বস্তুর বিষয়ে আমাদের জ্ঞান যত বৰ্দ্ধিত হইবে তত তাহা নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, ও কিছুকাল পরে আবার তাহা পুরাতন হইয়া চিত্তাকর্ষণ করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিবে। যে বস্তু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, তাহা শীঘ্র পুরাতন হয় ও যাহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ক্রমাগত বৰ্দ্ধিত হয়, তাহা চিরকালই নূতন থাকে ; যখন জ্ঞান আর অগ্রসর হইতে পারে না তখন তাহা আবার পুরাতন হইয়া যায়।

যেমন মার্জ্জারের দন্ত দেখিযা আমরা স্থির করি, তাহারা মাংসাশী, সেইরূপ মানবের নূতনের প্রতি এতটা অভিলাষ দেখিয়া স্থির করা যায় তাহারা স্বভাবতঃ জ্ঞানান্বেষী। অল্প বয়স হইতেই এই জ্ঞানের উন্মেষ হইতে থাকে। সামান্য জ্ঞান জন্মাইলেই তাহারা কল্পনাপ্রিয় হইয়া পড়ে। কারণ, জ্ঞানের অল্পতা-প্রযুক্ত কল্পনার দ্বারা তাহারা ঈপ্সিত-জ্ঞানের স্থানটী পূরণ করিতে চায়। তারপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন ভাব ও চিন্তাশক্তি প্রকাশ পায়। তখন মানব বিবেচনা করে তাহাদের সুখ দুঃখ কি? এই বিবেচনার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা নূতন ও পুরাতনের সহিত সুখ দুঃখের (Pleasure and pain) কতটা সম্বন্ধ বুঝিতে পারে। তাহারা স্থির করিতে পারে নূতনত্ব (Novelty) সুখের একটা কারণ। এইরূপে যত তাহাদের জ্ঞান বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে তত তাহারা বুঝিতে পারে যে বস্তুগুলি তাহারা জ্ঞাত ও পুরাতন বলিয়া ত্যাগ করিয়াছে, সে গুলির বিষয়েও অনেক জানিবার কথা আছে। তখন সেই পুরাতন বস্তুগুলি নূতন বিষয়ের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের চিত্তাকর্ষণ করে। এইজন্য যে পুরাতনে অতীতের স্মৃতি আছে, সে-পুরাতন আমাদের চিত্তাকর্ষক।

এখন আমাদের কথার সারাংশ এই ;— সকল বস্তু নূতন ও পুরাতন হইতে পারে— যখন তাহারা নূতন বলিয়া বোধ হয়, তখন বুঝা যায় পূর্ব্বে তাহাদের বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান আমাদের ছিল না ; যেগুলি পুরাতন বলিয়া বোধ হয়, সেগুলির সম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে ইহা বিশ্বাস করি।

নূতন ও পুরাতনে এই প্রভেদ। চিত্তাকর্ষণ করিবার শক্তির বিভিন্নতা দেখিয়া ইহাদের পার্থক্য স্থির করা যায় না। মানব জীবনে এমন এক একটী অবস্থা আসে, যখন পুরাতনের আকর্ষণে আমরা মুগ্ধ হই। বিপত্তির অন্ধকার যখন বৰ্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের উপর একটা কালিমা আনিয়া দেয়, যখন উত্তপ্ত জীবনের উপর একটা কল্পিত সুখের ছায়াও আনিতে সাহস হয় না, তখন আমরা বিগত জীবনের পুরাতন ঘটনাগুলি এক একটী করিয়া আলোচনা করিতে থাকি অনন্ত দুঃখের সময় হতাশ হৃদয় মানবের এক মাত্র সম্বল অতীতের স্মৃতি। বাস্তবিক আমরা সকল সময়ে নূতন ভাল বাসি না। যখন কোন দ্রব্য আমাদের নিকট অভ্যস্ত (Habituated) হইয়া পড়ে, তখন তাহা পুরাতন হইলেও আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে। কবি

Cowper-Olney নামক স্থান ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেন না কারণ Olneyতে বাস করা তাঁহার অভ্যাস (Habit) হইয়া পড়িয়াছিল। কেবল অভ্যাস নহে, আরও অনেক বিষয় আছে যাহা নূতনের প্রতি অনুরাগ একটু একটু করিয়া হ্রাস করিয়া দেয়। কতকগুলি মনোভাব (feeling) আছে যাহা কখন কখন নূতন ছাড়িয়া পুরাতনে মনকে নিয়োজিত করে। মাতার স্নেহ কখন কখন জ্যেষ্ঠ পুত্রে সমভাব ধারণ করিয়া নবজাত পুত্রের আকাঙ্খা করে না। প্রীতি-সম্বদ্ধা দম্পতীর মধ্যে পতি ভার্য্যাতে বীতরাগ হইয়া অন্য ভার্য্যার আকাঙ্খা করে না। যাহার উপর মায়া পড়িয়া যায়, মন তাহাতেই নিবিষ্ট থাকে। পুরাতন আদৃত ভৃত্যটীকে বিনা কারণে দূরীভূত করিয়া কেহ একটী নূতন ভৃত্যকে পূর্ব্বের স্নেহ মায়া মমতা দান করিতে ইচ্ছুক নহেন। পুরাতন বন্ধু নূতন বন্ধু অপেক্ষা প্রিয়। পিতা মাতার তটপ্লাবিনী স্রোতস্বতীর মত ধারাবাহী স্নেহ, ভ্রাতার অমৌখিক নিত্যানন্দদায়ী সৌহৃদ্য, ভার্য্যার স্নিগ্ধমসৃণ জাহ্নবীসলিলবৎ পূত প্রেম, হে নিঃসহায় স্বজনহীন মানব! মনে পড়ে কি? সেই পুরাতন সময় যখন তুমি পুরাতনের সহিত একটা মনোরম পুরাতন জগতে বিচরণ করিতে, মনে কর, তাহা আবার এখন তোমার নিকট ফিরিয়া আসিয়াছে। ভাবিয়া দেখ এখন তুমি পুরাতনে বিভোর, পুরাতনে তন্ময়, পুরাতনের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ। এখন আর তোমাকে নূতন ভাল লাগে না। তুমি নূতন প্রার্থনা করিয়া থাক, এতকাল নূতন প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছ, কিন্তু যে বস্তুর উপর তোমার একটা অকৃত্রিম ভালবাসা জন্মিয়াছে, তাহা তোমার, যাহার উপর তোমার মায়া মমতা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে জীবনে তুমি যাহার সঙ্গ ছাড়িতে অনিচ্ছুক তোমার প্রাণমন যাহাতে গ্রথিত তুমি তাহার বিচ্ছেদ সহিতে পারিবে না; ইহকালে কখন নহে। যদি আত্মা অক্ষয় হয়, তাহা হইলে পরকালেও তাহা পাইবার জন্য তোমার আকাঙ্খা পবন চালিত বহ্নির ন্যায় ধিকিধিকি জ্বলিতে থাকিবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।



শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার দত্ত।

# "কে বুঝিবে বিশ্ব বিধাতায়।"

[ ১ ]

অনাদি অনন্ত যিনি ধ্রুব-নির্ব্বিকার
জ্যোতির্ম্ময়, যাঁর তেজে দীপ্ত চারিধার
গ্রহতারা দিবাকর
এ জগত চরাচর,
যাঁহার ভ্রুকুটী ভঙ্গে ভ্রমে অনিবার
সৃষ্টি স্থিতি লয় যাঁর খেলা—এ ধরার ;
কল্প মন্বন্তর যাঁর
যু চারিটী চমৎকার,
বিপুল বিরাট কায়, দিগন্ত বিস্তার
বিশাল বিচিত্র বিশ্ব বিচিত্র সম্ভার,
ক্ষিত্যপ তেজ মরুৎ ব্যোমে
গড়েছে যে বিশ্ব ভূমে
তিনি কি, কেমন রূপ, কেমন আকার
কে বুঝিবে ! কে বুঝাবে ! স্বরূপ তাঁহার।

[ ২ ]

বৈজ্ঞানিক। জানি ঠিক জড় বই আর
তোমার ও রূপ তত্ত্বে নাহি অধিকার,
সৃষ্টি পদার্থেরি যার
বুঝা শোনা হল ভার
তুমি কি স্রষ্টার রূপ করিবে প্রচার ?
দার্শনিক। নয় ঠিক কল্পনা তোমার,
তোমার ও সূক্ষ্ম সুর
পড়ে থাকে বহু দূর
কার্য্য কারণের মূল অনন্ত, অপার
কেও বলে এ জগৎ তাঁহারি বিকার।

[ ৩ ]

সাধক সাধনা শেষ ক'রে হয় চুপ
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত দেখে তাঁর রূপ,
ও রূপ ভাবিয়ে তার
দূরে যায় অহঙ্কার,
অনাদি অনন্ত তিনি ধ্রুব নির্ব্বিকার
এই বলে সেও ধ্যানে মুগ্ধ অনিবার।
কবিরা কল্পনা বলে
যদিও বা কিছু বলে
কি সাধ্য বিরাট রূপ দেখায় তাঁহার
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মে যাঁর মহিমা প্রচার।

[ ৪ ]

সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম যাঁর মহিমা প্রচার,
কি ফলাবে চিত্রকর চিত্রে বিধাতার,
বিশাল যাঁহার কায়া
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া ছায়া
কি সাধে ধরিবে তুলি বল চিত্রকর
ও রূপ ধ্যানেই প্রাণ হয়ে যায় জড়।
নানা অবয়বে গড়া
নানা বর্ণে চিত্র করা
বিশাল বিচিত্রধরা বিচিত্র বাহার
তারি ছিটা ফোটা এঁকে এত অহঙ্কার ?

শ্রীগোপীনাথ বর্ম্মণ সিংহ।

---

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—আমাদের উপহার পুস্তক নিঃশেষিত হইয়াছে তবে যাহারা পূজার পূর্ব্বে গ্রাহক হইয়াছেন, তাঁহাদের নামে ক্রমশঃ ভিঃ পিতে উপহার পাঠাইব যাহাদের আপত্তি থাকে, সত্বর জানাইবেন।